ভুল করেছি ভালোবেসে

শুজা রশীদ

অনন্যা প্রকাশনী

এক

লোগান এয়ারপোর্ট, বোস্টন, ম্যাসাচুসেটস্।

পেন এসে পৌঁছেছে বিকেলের দিকে। কাস্টম্স এর ঝামেলা চুকিয়ে বাক্স–পেটরা নিয়ে যখন লাউঞ্জে এসে দাঁড়ালো ফায়জা ততক্ষণে ওর অধিকাংশ সহযাত্রীরাই প্রস্থান করেছে। ওর এটাই প্রথম আমেরিকায় পদার্পণ। সুন্দরী, অল্প বয়স্ক একটি বাংলাদেশী তরু ণী একাকী এসেছে–কাস্টমসের অফিসারটি স্বভাবতই কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলো। গাদা গাদা প্রশ্ন করে বিরক্তির একশেষ করেছে ফায়জাকে। তবুও ভালো যে কোন রকম ঝামেলা করেনি। করবার কথাও নয়। স্থানীয় একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসেছে ও। কাগজপত্র সব ঠিকঠাক। ইউনিভার্সিটি অব ম্যাসাচুসেটসের যথেষ্ট নাম আছে। অফিসারটি মুখে অকারণ একটি সন্দেহভাজন চিহ্ন ঝুলিয়ে রাখলেও ছিল–ছাপপড় যা মারার মেরে দিয়েছে। স্বস্তি র নিশ্বাস ফেলেছে ফায়জা। ইদানিং অনেকেই নাকি হেনস্থা হচ্ছে। গত কয়েকটা বছরে অনেক কড়া হয়েছে এখানকার প্রশাসন।

ফায়জা চারিদিকে ভালো করে চোখ বোলালো। স্পষ্টতই কাউকে খুঁজছে সে। খুব বেশী মানুষজন নেই লাউঞ্জে। সম্ভবত খুব শীঘ্রই অন্য কোন ফ্লাইট নেই। একবার নজর বুলিয়েই ফায়জা বুঝলো তার প্রার্থিত ব্যক্তি এখানে নেই। কারণটা তার কাছে পরিষ্কার হলো না। ব্যক্তিটির এখানে যে শুধু থাকবার কথা ছিলো তাই নয়, তাকে দেখে আনন্দে গদগদ হয়ে ছুটে আসাটাই আশাব্যঞ্জক ছিলো। হয়তো পথে আটকে গেছে, নিজেকে প্রবোধ দিলো ফায়জা, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো আসবার আগে পরিষ্কার করে তার পৌঁছানোর দিন–ক্ষণ জানিয়েছিল সে। দেরী হওয়াটা অস্বাভাবিক মনে হয়। অতীত যদি ভবিষ্যতের বাহক হয়ে থাকে তাহলে তার আকাংখিত যুবকটির এখানে ঘন্টাদুয়েক আগেই এসে দাঁড়িয়ে থাকবার কথা ছিলো। হতাশভাবে শ্রাগ করলো ফায়জা। কত কারণেই তো মানুষের দেরী হতে পারে। এতো অধৈর্য হবার কি হলো? সে ভারী বাক্স দুটিকে আছড়ে পিছড়ে টেনে কাছাকাছি একটি চেয়ারে বসলো। আসবে যখন বলেছে তখন নিশ্চয় আসবে। সে ক্লান্তি তে চেয়ারে শরীরটা একটু এলিয়ে দিয়ে বসলো। তার ঘন কালো চুলের রাশি পিঠময় ছড়িয়ে পড়েছে। কয়েকজন স্থানীয় যুবক ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে। ফায়জা ঠোঁট টিপে আপন মনে হাসলো। ছেলেরা সবাই একরকম। সুন্দর একটি রমনীর মুখ দেখলেই হলো চোখ আঁঠার মতো সেঁটে গেলো সেখানে। জাতে–বর্ণে কোন তফাত নেই।

প্রায় দৌড়ে ভেতরে ঢুকলো একটি দোহারা গড়নের বালসুলভ মুখমন্ডলের যুবক, শরীরের রং উজ্জ্বল গৌরবর্ণ হলেও তার ঘন কালো চুল এবং মুখের আদল থেকে ভারতীয় ছোঁয়া বুঝতে অসুবিধা হয় না। ঘন ঘন শ্বাস নিয়ে নিজেকে সুস্থির করবার ফাঁকে দ্রু ত চারিদিকে চোখ বোলালো যুবক তৎক্ষণাৎই ফায়জার উপরে তার নজর স্থির হলো। কয়েকটি মুহূর্ত সন্দিহান দৃষ্টি ক পর্যবেক্ষণ করলো সে। দ্বিধান্বিতভাবে কয়েকটি পদক্ষেপ এগিয়ে গিয়ে আবার থামলো, ভালো করে পরখ করলো ফায়জাকে।

যুবকটির অনাকাংখিত আগ্রহ ফায়জারও নজরে পড়েছে। সে সোজা হয়ে বসলো। ছেলেটিকে সে চেনে না। ছেলেটির ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে ফায়জাকে সে চেনে কিন্তু ঠিক নিশ্চিত হতে পারছে না। ফায়জা তার দিকে তাকাতেই ঝকঝকে দাঁত দেখিয়ে লাজুক একটি হাসি দিলো ছেলেটি। মনে হলো তার ইতস্ত ত ভাবটা ঝট্ করেই উধাও হয়ে গেলো। সে এবার বেশ দৃঢ়পায়ে ফায়জার সামনে এসে দাঁড়ালো।

–ফায়জা রহমান? প্রশ্নটি এলো ইংরেজিতে।

–জ্বি। ফায়জাও সুন্দর ইংরেজিতে উত্তর দিলো। ইংলিশ মিডিয়ামেই আজীবন পড়াশোনা করার ফল। বাংলা ও ইংরেজি দুটিতেই সে সমান দক্ষ। ছেলেটি হাস্যোজ্জ্বল মুখে বললো –আমার নাম এন্ডি মিলস্। আমি অমর মাহমুদের বন্ধু। ও আমাকে পাঠিয়েছে তোমাকে নিয়ে যাবার জন্য। সরি, খানিকটা দেরী হয়ে গেলো আমার। অনেকক্ষণ বসে আছো নিশ্চয়?

ফায়জা কয়েকটা মুহূর্ত হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলো। নিজের কানকে তার বিশ্বাস হচ্ছে না। সে বিমূঢ় ভঙ্গিতে বললো–অমর কোথায়? কথা ছিলো ও এসে আমাকে রিসিভ করবে!

এন্ডি কাঁচুমাচু হয়ে বললো–জানি। ওরও তাই ইচ্ছে ছিলো। কিন্তু হঠাৎ করে একটা সেমিনারে যেতে হলো ওকে। নিউ ইয়র্কে।

–তাই নাকি? ফায়জা দ্বিধান্বিত কণ্ঠে বললো। তার প্রচন্ড রাগ হচ্ছে। অমর এই ধরনের একটা কাজ করবে চিন্তাও করেনি সে। খুব ঢং করে বন্ধুকে পাঠিয়েছে। অথচ ফায়জাকে কিছু জানানোরও প্রয়োজন বোধ করে নি। এই ছেলেটি যে সত্যিই অমরের বন্ধু সেটা সে জানবে কি করে। এতো একটা বদমায়েশও হতে পারে।

এন্ডি বোধহয় তার মনের কথা পড়তে পারলো। সে ঝট্ করে পকেট থেকে একটা ছোট ফটো বের করলো। –আমি জানি তুমি কি ভাবছো। চেনা নেই জানা নেই এই ছেলেটা কোত্থেকে উড়ে এলো। এই পরিস্থিতি সামাল দেবার জন্যেই অমর আমাকে তোমার একটা ছবি দিয়েছে।

ভুল করেছি ভালোবেসে

থেকে নিজের ছবিটা নিয়ে ভালো করে দেখলো। এই ছবিটা ে কয়েক বছর আগে।

–অমর তোমাকে এই ছবিটা দিয়েছে। কাজটা তার ঠিক হয়নি।

–এই ছবিটা ছাড়া আমিই বা তোমাকে চিনতাম কি করে আর তুমিইবা কিভাবে নিশ্চিত হতে যে অমরই আমাকে পাঠিয়েছে। ভয় পেও না। আমি ওটার সাথে কোন রকম অসদাচরণ করিনি। যাই হোক, চলো যাওয়া যাক। আমি আবার টিচিং এসিস্ট্যান্ট। ঘন্টা দু'য়েকের মধ্যেই একটা ক্লাশ নিতে হবে। একটু তাড়া আছে আমার।

–আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না অমর আমাকে তোমার কথা বলতে একদম ভুলে গেলো। তোমার নামওতো ওর মুখে আমি কখনো শুনিনি। তাছাড়া ও আসবে না তাও তো আমাকে জানায়নি।

–হঠাৎ করেই সমস্যাটা হলো। ওরইতো আসবার কথা ছিলো। কিন্তু ওর প্রফেসর একরকম বেঁধেই নিউইয়র্কে পাঠিয়েছে ওকে। কিন্তু আমাকে বিশ্বাস করতে পারো তুমি। আমি শুধু ওর বন্ধুই নই, ওর র মমেটও।

–সরি। তোমার সাথে আমি যেতে পারবো না। অচেনা, অজানা কারো সাথে কোথাও যাওয়াটা আমার অভ্যাস নয়। কিন্তু আমার জন্য চিন্তা করো না। আমি একটা ট্যাক্সি নিয়ে আমার হলে চলে যাবো। আসার জন্য অনেক ধন্যবাদ। খামাখা কষ্ট দিলাম তোমাকে।

এন্ডির মুখটা মলিন হয়ে গেলো। –কিন্তু আমি যে অমরকে কথা দিয়েছি তোমাকে ঠিকঠাক মতো হলে পৌঁছে দেবো। অবশ্য তুমি আমাকে অবিশ্বাস করলে আমার কিছুই করার নেই।

–দেখো, তোমাকে আঘাত দেয়াটা আমার উদ্দেশ্য ছিলো না। এখানে আমি জীবনে প্রথম এসেছি। ঝট্ করে অজানা কাউকে বিশ্বাস করাটা আমার জন্য সহজ নয়।

শ্রাগ করলো এন্ডি। –ঠিক কথা। যাই হোক, তোমার সাথে পরিচয় হয়ে খুব ভালো লাগলো। আশা করি আবার দেখা হবে।

–নিশ্চয়। ফায়জা আর দাঁড়ালো না। সে তার বাক্স জোড়া টানতে টানতে বাইরে বেরিয়ে এলো। লাইন দিয়ে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। কিউতে প্রথম ট্যাক্সিতে উঠতে হলো তাকে। ট্যাক্সি ড্রাইভার ট্রাংকে তার সুটকেস দুটো চালান করে দিয়ে ড্রাইভিং সিটে এসে বসলো।

–কোথায় যাওয়া হবে, মিস্?

–ইউনিভার্সিটি অব ম্যাসাচুসেট্স, লোয়েল।

–ঠিক ক ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়লো ট্যাক্সি ড্রাইভার।

হঠাৎ পেছনের একটি দরজা খুলে ভেতরে লাফিয়ে ঢুকলো এন্ডি। ফায়জা বেশ হকচকিয়ে গেলো। এন্ডি কাঁচুমাচু মুখে বললো–ভয় পেও না। আমি শুধু তোমাকে নিরাপদে ডর্মে পৌঁছে দিতে চাই। অন্য কোন বদ উদ্দেশ্য নেই।

ট্যাক্সি ড্রাইভারটি ঘাড় ঘুরিয়ে এন্ডিকে পর্যবেক্ষণ করলো। –কোথায় যাবে তুমি?

–আমরা দুজন একই জায়গাতেই যাবো।

ড্রাইভারটি ফায়জার দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টি নিয়ে তাকালো। –ও এলে তোমার কোন অসুবিধা নেই তো, মিস্?

ফায়জা হতাশ ভঙ্গিতে না সূচক ঘাড় দোলালো। মুহূর্তের মধ্যে রাস্তায় নামলো ট্যাক্সি। ফায়জা আড়চোখে এন্ডিকে দেখলো। সুবোধ বালকের মতো বসে আছে। সুদর্শন তাতে কোন সন্দেহ নেই। সে কণ্ঠস্বর নিস্পৃহ রাখবার চেষ্টা করে বললো –আমি ভেবেছিলাম তুমি গাড়ী নিয়ে এসেছো।

–গাড়ী নিয়েই এসেছিলাম। পার্কিং লটে পার্ক করেছি। পরে এসে নিয়ে যাবো। অমরকে কথা দিয়েছি আমি সশরীরে তোমাকে ডর্মে নামিয়ে দিয়ে আসবো। আমি বাবা এক কথার মানুষ।

–অমরকে তুমি কতদিন ধরে চেনো?

–বছর পাঁচেক তো হবেই। অনেকদিন ধরেই আমরা রুমমেট। আমরা দু'জনই আবার একই এডভাইজারের অধীনে ডক্টরেট প্রোগ্রাম করছি। ওর সম্বন্ধে আমি প্রায় সবই জানি।

–আমার সম্বন্ধে ও তোমাকে কি বলেছে?

–বলেছে তুমি ভয়ানক সুন্দরী এবং খুবই চমৎকার মেয়ে। ওর সাথে তোমার বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো, অবশ্য ঠিক শারীরিক অর্থে ঘনিষ্ঠ নয় এবং তোমাদের দু'জনার পরিবারই তোমাদেরকে বিয়ের জন্য চাপ দিচ্ছে।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়লো ফায়জা। –দেখা যাচ্ছে তুমি সত্যিই ওকে চেনো। এমন পাতলা নাড়ি খুব কম পুরুষেরই আছে।

এন্ডি হাসলো। –এই জন্যেই ওকে আমার এতো পছন্দ। তা, তোমরা কবে বিয়ে করছো?

–কেন, তোমার বন্ধু তোমাকে সেটা বলেনি?

–আসলে বলেছে। তুমি কম্পিউটার সায়েন্সে মাস্টার্স শেষ করলেই তবে বিয়ে–শাদির প্রশ্ন। পাক্কা দু'বছরের ব্যাপার। ইতিমধ্যে পুরানো প্রেমটা আবার একটু জমে উঠবে। সেই রক

ভ্রূ কুঁচকালো ফায়জা। –আলাই মালুম, ও তোমাকে আরো কি কি বলেছে।

–খামাখা ওর উপরে রাগ করো না। আমরা ভাইয়ের মতো। সত্যি কথা বলতে কি তোমাকে দেখার পর ওকে আমার একটু হিংসাই হচ্ছে।

ফায়জা গম্ভীর থাকার চেষ্টা করলো কিন্তু সফল হলো না। এমন নগ্ন স্তুতিবাক্য শুনে হৃদয় চমকিত হয় না এমন মেয়ে ক'জন আছে।

সে ফিক্ করে হেসে ফেললো। তাকে হাসতে দেখে এন্ডির চোখ মুখ আলোকিত হয়ে উঠলো।

হলের গেটে ট্যাক্সিক্যাব থামতে ফায়জা এবং এন্ডি নীচে নামলো। ড্রাইভার ওর বাক্স দুটো ট্রাংক থেকে বের করে দিয়ে পয়সা নিলো। এন্ডি ফায়জার হাতে একটা পার্সোনাল কার্ড ধরিয়ে দিলো।

–এতে আমার যাবতীয় ফোন নাম্বার আছে। কোন রকম অসুবিধা হলেই কল করো।

ফায়জা লাজুক গলায় বললো–আমাকে সঙ্গ দেবার জন্য অনেক ধন্যবাদ। খারাপ ব্যবহার করবার জন্য খুবই দুঃখিত। রীতিমতো অপরাধী মনে হচ্ছে নিজেকে।

–খারাপ ব্যবহারটা কোথায় দেখলে! এমন রূপসী একটি মেয়ের পাশে কিছুক্ষণ বসতে পারলাম এতেই আমি ধন্য।

–তুমি খুব রসিকতা করো তো! আবার দেখা হবে।

–নিশ্চয় হবে। ভুলে যেওনা আমি অমরের ব্ল মমেট। যাই হোক, আমাকে এবার ফিরতি পথ ধরতে হবে। ক্লাশের সময় ঘনিয়ে আসছে।

–কোথায় থাকো তুমি?

–ক্যাম্পাসের ঠিক বাইরেই। দেখা হবে।

এন্ডি কথা না বাড়িয়ে ট্যাক্সিক্যাবে চাপলো। তাকে আবার এয়ারপোর্টে গিয়ে গাড়ী নিয়ে ফিরতে হবে। ফায়জা হাত নেড়ে তাকে বিদায় জানিয়ে হলের ভেতরে ঢুকলো।

দুই

মেয়েটিকে প্রথম দেখাতেই ভালো লাগলো ফায়জার। কৃষ্ণা, দোহারা, নজর কাড়া সুন্দরী, কিন্তু এক ফোঁটা অহমিকা নেই। একটু ঠোঁট কাটা। র‍ মমেট হিসাবে মন্দ হবে না, মনে মনে ভাবলো ফায়জা। মেয়েটির নাম অনীতা। সে ফায়জাকে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তার বেস্ট ফ্রেন্ড বানিয়ে ফেললো। নিজেই ফায়জার বিছানা ঠিক করে দিলো, জামা কাপড় গুছিয়ে ওয়াড্রোবে রাখতে সাহায্য করলো এবং রাতে নিজের সাপার ভাগাভাগি করে খেলো। ফায়জার কোন আপত্তিই কানে নিলো না। ফায়জা ভেতরে ভেতরে স্বস্তি র নিঃশ্বাস ছেড়েছে। তার মনের মধ্যেও র‍ মমেট নিয়ে একটু ভয় ছিলো। অনীতাকে পেয়ে সেই ভয় অমুলক মনে হলো। অনীতাও খুশীতে গদ গদ। সে খোলাখুলিভাবেই সবাইকে বলে বেড়াতে লাগলো –ভেবেছিলাম না জানি কোন ডাইনি এসে জুড়ে বসে। ঈশ্বরের কৃপায় এই যাত্রা রক্ষা পাওয়া গেল।

কয়েকদিন বাদেই ভেতরের রহস্য ফাঁস হলো ফায়জার কাছে। জেসলিন নামে একটি মেয়ের সাথে একই র‍ মে থাকবার কথা ছিলো অনীতার। মেয়েটির সাথে তার দা–কুমড়া সম্পর্ক। কেউ কাউকে অপমান করবার সুযোগ ছাড়ে না।

দেখতে দেখতে সপ্তাহ গড়িয়ে গেলো। নিজেকে একটু গুছিয়ে নিয়ে বসেছে ফায়জা, বেশ কিছু বান্ধবী হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। ক্লাশ শুর‍ হয়েছে পুরো দমে। পড়াশুনায় সে বরাবরই সাংঘাতিক সিরিয়াস। এখানেও তার অন্যথা হচ্ছে না। কিন্তু একটি ব্যাপারে সে খুবই বিরক্ত এবং অল্প বিস্ত র উদ্বিগ্নও। এই ক'দিনেও অমর তাকে ফোনও করেনি, দেখা করতেও আসেনি। ফায়জা আশা করেছিলো ভার্সিটির ভেতরে দেখা হবে। হয়নি। এমনকি এন্ডির সাথেও দেখা হয়নি। অমরের তো এমন করবার কথা নয়। অন্য কোন সমস্যা তো হলো না? সে একটু অসহায়ই বোধ করতে লাগলো। কাউকে বলতেও পারছে না লজ্জার মাথা খেয়ে। আত্মসম্মান বোধটি আবার সাধারণের চেয়ে তার একটু বেশীই। এতোখানি পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে ফায়জা, তার সাথে দেখা করবার তাগিদটা অন্য পক্ষেরই বেশী থাকা উচিৎ। অমরের জন্যই একরকম এখানে আসা। না হলে হয়তো দেশেই মাস্টার্স করতো সে। একমাত্র মেয়েকে বিদেশে পাঠাতে তার বাবা–মা মোটেই রাজি ছিলেন না।

শেষ পর্যন্ত নিদেন পক্ষে এন্ডির দেখা পাওয়া গেলো। ক্লাশ থেকে মাত্র বেরিয়েছে ফায়জা। হন্তদন্ত হয়ে কোথায় যেন যাচ্ছিলো এন্ডি, একেবারে মুখোমুখি পড়ে গেলো। এন্ডি বত্রিশ পাটি দাঁত দেখিয়ে হাসলো।

–আরে, তুমি! কেমন আছো?

–ভালো। তোমার খবর কি?

–আছি একরকম। ভয়ানক চাপ যাচ্ছে।

ভুল করেছি ভালোবেসে

করে বললো –অমর কোথায়? এখনো ফেরেনি ও? প্রায়তো সপ্তাহ খানেক হয়ে গেলো।

–ওহ্, একেবারেই ভুলে গেছি। আমারই অপরাধ। অমর এখনও ফেরেনি। স্বীকার করছি তোমাকে জানানো উচিৎ ছিলো আমার। কিন্তু ভালো খবর হলো, খুব শীঘ্রই ফিরে আসবে ও। এবার মুখ থেকে ঐ মেঘের ঘনঘটা সরিয়ে ফেলো।

হাসতে পারলো না ফায়জা। সে বিরক্ত কণ্ঠে বললো –আমাকে তো একটা ফোনও করতে পারতো অমর। হলে ফোন করে নাম বললেই ফোন নাম্বার পেয়ে যেতো।

এন্ডি ঘাড় ঝাঁকালো। –তার কাজ কারবারই আলাদা। তুমিই তাকে আমার চেয়ে ভালো চিনবে। যাইহোক, আমাকে এখুনিই যেতে হবে। তোমার সাথে দেখা হয়ে খুব ভালো লাগলো। মন খারাপ করো না। সব ঠিক হয়ে যাবে।

ফায়জা কিছু বলার আগেই ঝট্ করে সরে গেলো এন্ডি। দ্রু তবাঁক নিয়ে চোখের আড়াল হয়ে গেলো। ফায়জা স্পষ্টতই নিরাশ হয়েছে। এন্ডির ভাবসাব তার কাছে বিশেষ ভালো লাগে নি। কোন ঝামেলায় পড়েনি তো অমর?

এন্ডি একরকম দৌড়ে এসে ঢুকলো কম্পিউটার ল্যাবে। বেশ প্রশস্ত কামরা। নানান ধরনের কম্পিউটার এবং কম্পিউটিং সংক্রান্ত যন্ত্রে ভর্তি। এটাই তার এবং অমরের রিসার্চ ল্যাব। এখানেই তাদের দিনের অধিকাংশ সময় কেটে যায় নানান ধরনের রিসার্চের কাজে। কত রাত ওরা দু'জন প্রোগ্রাম লিখে পার করে দিয়েছে।

অমর বুঁদ হয়ে একটা প্রোগ্রাম ডিবাগ করার চেষ্টা করছিলো। ছুটন্ত পদধ্বনি শুনে মুখ তুলে তাকালো। তার দৃষ্টিতে প্রশ্ন এবং বিরক্তি।

এন্ডি হাঁপ ছেড়ে বললো–খুব রেগে আছে। তোর বোধহয় এবার ওর সাথে আলাপ করা উচিৎ।

অমর চিন্তিত মুখে বললো–কেমন আছে ফায়জা?

–ভালোই। বেশ সহজেই খাপ খাইয়ে নিয়েছে।

–ওর বাবা বাংলাদেশের মিনিস্ট্রি অব ফরেন এফেয়ার্সে কাজ করতেন। বহু দেশ ঘুরেছে ওরা।

–সন্দেহ নেই। খুবই সপ্রতিভ মেয়ে!

–তুমি আর কোনদিন বদলাবে না। কণ্ঠস্বরটি একটি নারীর। এন্ডি এবং অমর দু'জনাই চমকালো। তাদের দৃষ্টি গিয়ে পড়লো দরজার দাঁড়িয়ে থাকা রুষ্ঠ মুখের মেয়েটির উপরে। ফায়জা! সে কয়েক কদম হেঁটে ওদের কাছাকাছি এসে দাঁড়ালো। অমরকে লক্ষ্য করে বললো–এতো অবাক হবার ভান করো না। জানতাম কিছু একটা গড়বড় আছে। সেই জন্যেই এন্ডির পিছু নিলাম। ভেবেছিলে আমাকে এতো সহজে গাধা বানাবে!

অমর হতাশ কণ্ঠে বললো–যাহ্ পুরো মজাটাই মাটি করে দিলে তুমি। আমি তোমাকে একটি সারপ্রাইজ দিতে চেয়েছিলাম।

–নিশ্চয়! ঠিক আগের মতই আছো। ফিরেছো কবে?

–এইতো, গতরাতে। তোমার সম্মানে একটা সারপ্রাইজ পার্টি ছুড়বার পরিকল্পনা করছিলাম আমরা।

–হ্যাঁ, সারাক্ষণ শুধু পার্টি পার্টি, কখন দেখা করতে পারবে?

–পাঁচটার দিকে। আমাকে এখন একটা ল্যাব নিতে হবে।

–সামনের লবিতে অপেক্ষা করবো আমি। আমাকেও ছুটতে হবে। ক্লাশ বোধহয় শুরু ই হয়ে গেলো। যাই আমি। আর কোন সারপ্রাইজ না।

অমর শ্রাগ করলো। –অবশ্যই না।

ফায়জা বের হতেই এন্ডি বললো–একেবারে হাতে নাতে ধরে ফেলেছে আমাদেরকে। সাংঘাতিক চালু মেয়ে।

অমর বললো–সব সময়ই এই রকম।

–সুন্দরীও বটে। দেখলে কাঁপাকাঁপি শুরু হয়ে যায়। যাই হোক, আমাকেও ছুটতে হবে। পরে দেখা হবে।

এন্ডি দ্রু তপায়ে বেরিয়ে গেলো। অমর চিন্তি তমুখে চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিলো। তাকে খানিকটা বিচলিতই দেখায়।

তিন

বিশাল বড় ইউনিভার্সিটি চত্বর। চারিদিকে ছাত্র–ছাত্রীর ভীড়। বিকেল পাঁচটায় অনেকগুলো ক্লাস ভেঙ্গেছে। হুড়মুড় করে যে যার পথে চলে যাচ্ছে। অমরকে নিয়ে সেই ভীড় থেকে একটু বাইরে বেরিয়ে এসেছে ফায়জা। পায়ে চলা পথ ধরে হাঁটছে দু'জন, ভদ্রতাসূচক দূরত্ব বজায় রেখেছে। অমর আমেরিকা আসবার আগে ওরা হাত ধরেই হাঁটতো। ফায়জা আশা করেছিলো অমর ওর হাত ধরবে। কিন্তু অমর তেমন কোন চেষ্টা করেনি। সম্ভবত মাঝখানের বিরহে দু'জনার মধ্যে খানিকটা দূরত্ব তৈরি হয়েছে। এটা অস্বাভাবিক নয়। নিজেকে বোঝালো ফায়জা। সে নিজেও তো আগ বাড়িয়ে অমরের হাত ধরেনি। কেমন যেন লজ্জাই করলো।

ফায়জা কয়েক মুহূর্তের নিঃশব্দতা ভেঙ্গে বললো–বিশ্বাসই হয় না কতদিন পরে পাশাপাশি হাঁটছি আমরা। ঢাকার কথা মনে আছে তোমার? কেমন উড়ে উড়ে বেড়াতাম আমরা!

অমর স্মিতমুখে বললো–কেন থাকবে না।

–আমি ছিলাম সতেরো, তুমি উনিশ। সেই দিনগুলো আবার ফিরে পেতে ইচ্ছে হয়।

অমর হাসলো। –তুমি বরাবরই একটু কাব্যিক। এখনো কবিতা টবিতা লেখো নাকি?

–মাঝে মাঝে। তুমি তো কখনো আমার কবিতা ছুঁয়েও দেখোনি।

–সাহিত্যে আমার আগ্রহ নেই।

–মাঝে মাঝে আমার অবাকই লাগে। আমরা দু'জন দুই জগতের মানুষ তারপরও কিভাবে যেন মনের মিল হয়ে গেলো। তুমি পার্টি, হৈ চৈ পছন্দ করো, আমি চুপচাপ পরিবেশ। তুমি শিল্পকলায় মোটেই আগ্রহী নও অথচ ওটাই আমার জীবন।

–আমারও আশ্চর্যই লাগে।

কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। আবার ফায়জাই নীরবতা ভাঙ্গলো। –আমেরিকা আসবার পরে তুমি কিন্তু খানিকটা বদলে গেছো। দেশে থাকতেও যেভাবে সকাল বিকাল ফোন করতে, এতো দূরে এসেও তার একাংশও করনি।

অমর বললো – পি.এইচ.ডি করাটা সহজ নয়। মাঝে মাঝে খেতেও ভুলে যাই।

–এয়ার[illegible]র বদলে তোমার বন্ধুকে দেখে আমি একটু ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম। [illegible] কত ছেলেই তো পাল্টে যায়।

অমর তরল গলায় হাসলো। –ওহ্ তোমাকে তো বলাই হয়নি। এন্ডি সারাক্ষণ তোমার প্রশংসার পঞ্চমুখ।

–তাই নাকি? কেন?

–তোমার সৌন্দর্যে মজেছে, আর কেন।

–লম্বা, সুদর্শন। ভাবনায় ফেলে দিলে।

–আমার কপাল পুড়লো। দু'জনেই কণ্ঠ মিলিয়ে হাসলো।

হাসি থামতে অমর বললো–ভুলে যাবার আগেই বলে রাখি, আগামী শনিবার রাতে আমাদের পার্টি। অন্য কোন প্যান করো না।

ফায়জা ঠোঁট বাঁকালো। –তুমি আর তোমার পার্টি। না গেলে আমার জীবনই বৃথা।

ফায়জা এবং অনীতা ক্যাফেটারিয়ায় বসে গল্প করছিলো। পরের ক্লাসের এখনো অনেক বাকী। ফায়জা ডর্মে ফিরে যেতে চেয়েছিলো কিন্তু অনীতা ওকে একরকম জোর করেই ক্যাফেটারিয়ায় নিয়ে এলো। এই এলাকাটা দিনের সব প্রহরেই সমানভাবে জমজমাট থাকে।

নানান বয়সী ছেলে মেয়েদের কল–কাকলিতে মুখরিত পরিবেশ। অনীতার এই জাতীয় ভিড়–ভাট্টা পছন্দ। ফায়জার বরং একটু নিরালা পরিবেশই ভালো লাগে। কিন্তু অনীতার খপ্‌পরে পড়লে কোন ছাড়াছাড়ি নেই। রসিয়ে রসিয়ে তার ক্লাবকদের গপ্প করছিলো অনীতা। কোন রকম আলামত না দিয়ে ঝড়ের মতো এসে হাজির হলো জেসলিন। অনীতাকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে ফায়জাকে লক্ষ্য করে বললো–কেমন আছো ফায়জা? সেদিন হলে পরিচয় হয়েছিলো, মনে আছে তো?

ফায়জা ঘাড় নাড়লো। –হ্যাঁ, নিশ্চয়।

সে জানে অনীতা এই মেয়েটিকে দু' চোখে দেখতে পারে না। কতখানি আগ্রহ দেখানো ঠিক হবে বুঝতে পারছে না। অনীতার আবার খুব রাগ। অনীতা মুখ বাঁকিয়ে বললো –না দেখার ভান করো, ফায়জা। খামাখা জ্বালাতে এসেছে।

জেসলিন তার দিকে অগ্নি দৃষ্টি হেনে নরম কণ্ঠে ফায়জাকে বললো –তোমার সাথে একটু একাকী কথা বলা যাবে?

অনীতা বক্রোক্তি করলো–যাও ফায়জা। নিশ্চয় আজগুবি কিছু একটা বলবে। ও হচ্ছে মিস্ ভুল করেছি ভালোবেসে।

জেসালন খোকয়ে উঠলো –বেশী বক বক্ করবে না, অনীতা।

সে ফায়জাকে এক রকম ঠেলেই একটু দূরে সরিয়ে নিয়ে এলো।

–এন্ডির সাথে তোমার কিভাবে পরিচয় হলো?

–ও অমরের রুমমেট। কেন?

–তুমি অমরকে চেনো?

–ও আমার বয় ফ্রেন্ড। তুমি চেনো ওকে?

–গত সেমিষ্টারে আমার টিচিং এসিস্ট্যান্ট ছিলো। তুমি তাহলে এন্ডির প্রতি আগ্রহী নও?

–না, না। হঠাৎ এই কথা কেন জানতে চাইলে?

–আমার কয়েকজন বন্ধু তোমাদের দুজনকে একসাথে দেখেছে। আমি ভেবেছিলাম তোমাদের দু'জনার মধ্যে আবার কিছু হচ্ছে কিনা। তোমাকে সত্যি কথাই বলি। আমরা বছর দু'য়েক প্রেম করেছিলাম। আস্ত হারামি। শেষতক ছেড়ে দিলাম। ওর ধারে কাছেও যেও না। তোমার জীবনটা শেষ করবে। আচ্ছা আমাকে যেতে হবে এখন। পরে দেখা হবে আবার।

–হ্যাঁ, নিশ্চয়। ফায়জা একটু ভ্যাবাচ্যাকাই খেয়ে গেছে। কথা নেই বার্তা নেই এই জাতীয় উপদেশ যেঁচে দেবার কারণটা তার কাছে পরিষ্কার হলো না। জেসলিন হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেলো ক্যাফেটারিয়া থেকে। ফায়জা অনীতার কাছে ফিরে এলো।

অনীতা বললো –নিশ্চয় এন্ডির সম্বন্ধে কিছু বলেছে?

ফায়জা অবাক হলো। –তুমি কিভাবে জানলে?

–সারা ভার্সিটি জানে। এন্ডি ওকে ডাম্প করেছে। ও খুব চেষ্টা করছে এন্ডিকে পটাতে। অমন উড়নচন্ডিকে কোন্ ভদ্র ছেলে পছন্দ করবে? যত্তো সব। চলো, আমাদের ল্যাব আছে।

ফায়জা নিরু ত্তরে অনীতাকে অনুসরণ করলো। অনীতারও কি এন্ডির প্রতি আগ্রহ আছে? অসম্ভব নয়। সে নরম কণ্ঠে বললো –জেসলিনের সাথে তোমার এতো রেষারেষি কেন?

–কেন আবার? এন্ডি। গত সেমিষ্টারে আমারও টিচিং এসিস্ট্যান্ট ছিলো ও। এমন অদ্ভুত একটি ছেলে! আলাহই জানে ওর মন পাবার জন্য কত কিই না করেছি। এমনিতে কবিতা লেখে, বৃষ্টিতে ভেজে, চাঁদনী রাতে মাছ ধরতে যায় অথচ একটা মেয়ের মন বোঝে না। আমার ধারণা জেসলি ১৭ রর জন্যেই এন্ডি সাহস করে আমার সাথে প্রেম করেনি।

–তুমি ওকে তোমার মনের কথা বলেছিলে?

–নিশ্চয় না। আমাকে এত সস্তা ভেবেছো। হাবে ভাবে বুঝিয়ে ছিলাম। এন্ডি বললো ও কোন সিদ্ধান্তে ঝট্ করে যেতে চায় না। গর্দভ একটা। কিন্তু কি রত্ন হারালো জানলও না।

ফায়জা ফিক্ করে হেসে ফেললো। –ওকে দেখে আমারতো তেমন কাব্যিক মনে হয়নি।

অনীতা ঠোঁট বাঁকালো। –তার বাইরের চেহারা দেখে ঝট্ করে ভেতরটা বোঝা যায় না।

ল্যাবে ঢুকেই অনীতার তাড়াহুড়ার কারণ পরিষ্কার হলো। এন্ডি বাকবোর্ডে কিছু একটা লিখছে। ফায়জা বললো–এন্ডি এখানে কি করছে? এই ল্যাবটাতো অন্য একজন নিতো।

অনীতা নিস্পৃহ কণ্ঠে বললো–সে চাকরি নিয়ে চলে গেছে। এন্ডিই তত্ত্বাবধায়ন করবে এখন থেকে।

–নিশ্চয়! নইলে তোমার এতো ছুটাছুটি করে ল্যাবে আসা কেন?

–বাজে কথা বলো না, এই এন্ডি, কেমন আছো?

এন্ডি শ্রাগ করলো। –এই তো চলছে। কোন রকম প্রেম পীরিতের আলাপ শুরু করবে না।

–বাব্ বাহ, এখন দেখি ঠাট্টা করতে শিখে গেছো! খুবই ভালো লক্ষণ। গাধা মানুষ হচ্ছে।

–এই শুরু হলো আবার!

উপস্থিত ছাত্র–ছাত্রীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন সশব্দে হেসে উঠলো। বোঝা গেলো অনীতার এন্ডি-প্রীতির কথা অনেকেরই জানা। এন্ডি ফায়জাকে দেখেই এগিয়ে এলো।

–আরে ফায়জা! কেমন আছো তুমি? তুমিও যে এই ক্লাসে আছো জানতাম না।

অনীতা ভ্র কুঁচকে বললো–ও ভালোই আছে। ওর র মমেট ভালো নেই। তার হৃদয় জুড়ে শুধু তুমি আর তুমি। প্রিয়, কিছু একটা বলো। আবার বিকট হাস্যরোল উঠলো।

এন্ডি শাসালো–যতো ইচছা বলো। পরে এর শোধ নেবো, অনীতা। আচ্ছা ফায়জা, পরে কথা হ

ভুল করেছি ভালোবেসে

এন্ড দ্রু তপায়ে বাকবোর্ডে ফিরে যায়। ফায়জা অনীতাকে লক্ষ্য করে মুচকি হেসে বললো –চালিয়ে যাও র মমেট!

অনীতা চোখ টিপলো।

পড়াশুনার চাপ বেড়েছে। আজকাল লাইব্রেরীতে প্রচুর সময় কাটাতে হয় ফায়জাকে। র মে পড়াশুনা হয় না। অনীতা সারাক্ষণই দলবল নিয়ে হৈ চৈ করছে। ফায়জা সুযোগ পেলেই লাইব্রেরীতে চলে আসে। ঘন্টা দুয়েক পড়াশুনা করে বিকেলের দিকে একটু হেঁটে মাথাটা পরিষ্কার করতে বেরিয়েছিলো, একেবারে এন্ডির মুখোমুখি পড়ে গেলো। এন্ডি দন্ত বিকশিত করে বললো –আরে তুমি? কেমন আছো?

–ভালোই। তোমার কি খবর?

–চলে যাচ্ছে। অনীতা কোথায়?

–দুপুরে র মেই ছিলো। বলছিলো ওর বোনের ওখানে বেড়াতে যাবে।

–তোমার সাথে হাঁটলে আপত্তি আছে?

–না, আপত্তি কিসের। এমনিই হাঁটতে বেরিয়েছিলাম। বিকেলের বাতাসটা খুব ভালো লাগে। তুমি কোত্থেকে?

–আমিও হাঁটতে বেরিয়েছিলাম।

ফায়জা মুচকি হাসলো। এন্ডিকে সে লাইব্রেরীর ভেতরে দেখেছিলো। নিশ্চয় ওকে বের হতে দেখে সেও বেরিয়েছে।

বিকেলে ভার্সিটি প্রাঙ্গণ ছেলে মেয়েদের প্রাণবন্ত উপস্থিতিতে ভরপুর। বহু ছেলে ও মেয়ে জোড়ে জোড়ে বসে আছে। কেউ কেউ বেশ অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে। তাদের মাঝ দিয়ে এন্ডির সাথে হাঁটতে কিছুটা লজ্জাই লাগছে ফায়জার। এন্ডি নির্বিকার মুখে বললো–এখানে কেমন লাগছে তোমার?

–খুবই ভালো। যদিও অমরের সাথে আরেকটু বেশী বেশী দেখা হলে খুশী হতাম। তারতো দেখাই পাওয়া যায় না।

–রিসার্চের কাজে ভয়ানক ব্যস্ত বেচারি।

–তাই বলে আমাকে অবজ্ঞা করার অধিকার ওর নেই। মেয়েরা এটা পছন্দ করে না।

–সেটুকু ইতিমধ্যেই বুঝেছি। তাদের প্রয়োজন চাটুকারিতা।

–মোটে ১৯ সুন্দর করে দু'টো কথা বললেই আমরা পটে যাই।

–আমি কি সুন্দর করে কথা বলি না?

ফায়জা হাসলো। –হ্যাঁ বাবা, তুমি খুব সুন্দর করে কথা বলো।

–শুনেছি তুমি কবিতা লেখো।

–মাঝে মাঝে।

–তোমার প্রিয় বিষয় কি?

–ঝড়।

–আমার হচ্ছে জলপ্রপাত। মাঝে মাঝে কবিতা বদল করা উচিৎ আমাদের।

ফায়জা হাসলো। –ক্ষতি কি! তোমার বন্ধু অবশ্য হিংসায় বাঁচবে না।

–সেটাও নিতান্ত মন্দ হবে না।

দু'জনে গলা মিলিয়ে হাসলো ওরা।

এন্ডি বললো–শনিবার পার্টিতে কার সাথে যাচ্ছো?

–অনীতার সাথেই সম্ভবত। ও তো নিমন্ত্রণ পেয়েছে, তাই না?

–নিমন্ত্রণের জন্য অপেক্ষা করার মেয়ে সে নয়। যদি কোন সঙ্গী না পাও আমাকে ফোন করো। আমি এসে তোমাকে নিয়ে যাবো।

–তার দরকার হবে না মনে হয়। তবুও অন্য কোন উপায় না থাকলে নিশ্চয় জানাবো তোমাকে। আচ্ছা, এবার আমাকে লাইব্রেরী ফিরতে হবে। অনেক পড়া বাকি। খামাখা কষ্ট করে আমার সাথে এতোখানি হাঁটলে।

এন্ডি রাজকীয় কায়দায় মাথা নোয়ালো। –আনন্দ পুরোটাই আমার, মহারাণী!

ফায়জা না হেসে পারলো না। এন্ডিতো খুব ফাজিল আছে!

চার

ভুল করেছি ভালোবেসে

অমর এবং এন্ডির এপার্টমেন্টটি বেশ বড়সড়ই। দুই বেডরুম, প্রশস্ত লিভিংরুম, বেলকনি, ছোট্ট একটি ডাইনিং স্পেস। লিভিংরুম সংলগ্ন ছোট কিচেন প্রায় অব্যবহৃতই পড়ে থাকে। রিসার্চের কাজে দু'জনাই এমন ভয়ানক ব্যস্ত থাকে যে রান্নাবান্না করার সময় হয়ে ওঠে না; বাইরেই খেয়ে নেয়। কালে ভদ্রে অমর দেশী খাবারের স্বাদ পাবার জন্য রান্নার চেষ্টা করে;

কিন্তু ফলাফল কখনই বিশেষ সুবিধার হয় না। এই সমস্ত ঝাঁঝালো গন্ধ তার কাছে অসহনীয় লাগে। মাত্র রাত আটটা বাজে। এর মধ্যেই পার্টি বেশ জমে উঠেছে। বন্ধু–বান্ধব সবাইকেই আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আর কিছু না হোক বিয়ারের লোভে অনেকেই ঢু মারে। অনেকে আসে নারীভাগ্য যাঁচাই করতে। পার্টিতে এসে অধিকাংশ মেয়েরাই বিয়ার টেনে একটু হালকা মেজাজে থাকে। ঘনিষ্টতা হবার এর চেয়ে ভালো পরিস্থিতি আর হয় না।

পার্কিং লটে গাড়ী থামালো অনীতা। তার পাশেই লাজুক মুখে বসে আছে ফায়জা। কথা নেই বার্তা নেই ঝট করে অমরের বন্ধুদের সামনে যেতে তার একটু লজ্জাই করছে। এমন হৈচৈয়ের মধ্যে সে খুব একটা স্বস্তিও বোধ করে না। অনীতা মুচকি হাসলো। –এমন ঘাবড়ে গেছো তুমি? সহজ হও। এখানকার পার্টিতে খুব মজা হয়। শুধু মনে রাখবে, কোন ছেলেকে খুব কাছাকাছি ঘেষতে দেবে না। ওদের হচ্ছে ছোঁক ছোঁক স্বভাব।

ফায়জা ভ্রূ কুঁচকালো। –কি যা তা বলছো!

অনীতা কলকলিয়ে হাসলো। –ঠাট্টা করলাম। কিন্তু তবুও সাবধান থেকো। ছেলেদের স্বভাবতো জানোই। দু' একটা বিয়ার পেটে পড়লে তাদের মাথার ঠিক থাকে না। আচ্ছা চলো, ভেতরে যাওয়া যাক। পার্কিং লটে অনেক গাড়ী দেখছি। ইতিমধ্যেই মনে হয় অনেকেই চলে এসেছে।

গাড়ী থেকে নেমে অনীতাকে অনুসরণ করে একটা এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে ঢুকলো ফায়জা। সবুজ একটি সালোয়ার কামিজ পরেছে সে। অনীতা আপত্তি করেছিলো, শার্ট–প্যান্ট পরাতে চেয়েছিলো। ফায়জা রাজী হয়নি। শার্ট–প্যান্ট সে পরে না তা নয়, কিন্তু খুব একটা স্বস্তি বোধ করে না। অনীতা পরেছে অসম্ভব টাইট জিনস এবং খুব খাটো একটি বাউজ। ছেলেরা গা ঘেষাঘেষি তো করবেই। ফায়জা ডর্মে থাকতেই আপত্তি জানিয়েছিলো, অনীতা চোখ টিপছে। –বুড়ী হয়ে যাচ্ছি একটা ছেলেটেলেতো বাগাতে হবে, নাকি? তোমার তো অমর আছে, তোমার চিন্তা কি!

কথাও বলতে পারে মেয়েটা। ফায়জাকে চেপে যেতে হয়েছে। এলিভেটর ধরে তিনতলায় চলে এলো ওরা। প্যাসেজে নেমেই অদূরে একটি এপার্টমেন্টের প্রচন্ড হৈ হট্টগোল কানে এলো। বেশ জোরে সোরে গান বাজছে। অনীতার যেন আর তর সইছে না। সে লম্বা লম্বা পদক্ষেপে [২১] ন চলে এলো। দমাদম কিল চললো নিরীহ দরজাটার উপরে। প্রায় তৎক্ষনাৎ খুলে গেলো সেটা। আকর্ণ বিস্তৃত হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এন্ডি। ফায়জাকে দেখে তার মুখের হাসি আরো বিস্তৃত হলো। –অনেকক্ষণ ধরেই ভাবছিলাম তোমাদের এতো দেরী হচ্ছে কেন? ভেতরে এসো। আজকের পার্টিতে তুমি আমাদের বিশেষ অতিথি। শেষ উক্তিটি ফায়জাকে উদ্দেশ্য করে করা।

অনীতা ফায়জাকে কিছু বলার সুযোগ দিলো না। –কেমন দেখাচ্ছে আমাকে, প্রিয়তম?

শ্রাগ করলো এন্ডি। –চমৎকার! এসো ফায়জা।

ফায়জা মুচকি হাসলো। অনীতার সামনে পড়লেই বেচারা এমন ঘাবড়ে যায়। –পার্টি দেখি খুব জমে উঠেছে!

এন্ডি দেয়ালের সাথে সেঁটে দাঁড়িয়ে ওদেরকে ঢোকার জায়গা করে দিলো। –এখনো অনেকে আসার বাকি।

অনীতা ফায়জার হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়লো। –চলো, একটা বিয়ার টানা যাক।

ফায়জা ঐ বস্তু কখনো মুখে তোলেনি, তোলার প্রশ্নও উঠেনা। কিন্তু তবুও সে অনীতাকে অনুসরণ করলো। এখানে কাউকেই চেনে না সে। অমরকেও কোথাও দেখছে না। অতিথিদের মধ্যে কেউ কেউ অবশ্য তার দিকে কৌতুহলী দৃষ্টি মেলে দেখছে। ফায়জার খুবই লজ্জা করছে। না জানি অমর তাকে অবাক করে দেবার জন্য কি পরিকল্পনা করেছে। এই জাতীয় কাজে তার

জুড়ি মেলা ভার। অনীতা ফ্রিজ থেকে দু'টা বিয়ার বের করে নিজে একটা নিলো, অন্যটা ফায়জার দিকে বাড়িয়ে ধরলো।

ফায়জা চোখ মটকালো। –এসব আমি খাই না।

–আরে খেতে বলেছে কে? একটা হাতে ধরে রাখো, দেখতে ভালো লাগে।

–মোটেই না। তুমি দু'টা দু'হাতে ধরে রাখো। তোমাকে ডাবল ভালো দেখাবে।

অনীতা খিল খিল করে হাসলো। –খুব চালু হচ্ছো! আমার আবার পেটে এই বস্তু খানিকটা না পড়লে পার্টিই শুরু হয় না।

–বেশী খেয়ো না। মাতাল হলে কিন্তু ঝাড়ি খাবে।

ই একদল ছেলে মেয়ে ওর নাম ধরে খুব শোরগোল তুলে ফেললো। হাতছানি দিয়ে ওকে ডাকছে তারা। অনীতা যাবার আগে সংক্ষেপে বললো–কোন সমস্যা হলে চিৎকার করে ডাকবে। লজ্জা করবে না।

–আমাকে নিয়ে তোমার চিন্তা করতে হবে না। মাতাল হলে আজ তোমার কপালে দুঃখ আছে।

অনীতা গলা ফাটিয়ে হাসতে হাসতে ছেলে–মেয়েদের সঙ্গে মিশে গেলো। ফায়জা চারিদিকে তাকিয়ে অমরের খোঁজ করলো। তাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। তবে এন্ডিকে দেখা গেলো। সে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। তার আগ্রহ বুঝতে ফায়জার খুব একটা অসুবিধা হলো না। সে এন্ডির চোখ এড়িয়ে ভীড় ঠেলে বেলকনিতে চলে এলো। এখানটাতেই একটা ফাঁকা আছে। তার মনটা একটু খারাপই লাগছে। পার্টিতে আসতে বলে অমর এখনো দেখাও দিলো না! সব সময়ই এই রকম খামখেয়ালি। সে রেলিঙে হেলান দিয়ে সম্মুখের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকে। অমরের সাথে তার অনেক পার্থক্য। বলা চলে ওরা দু'জন দুই মেরুর মানুষ। তারপরও কেমনভাবে যে তাদের হৃদয় বাঁধা পড়েছিলো, ভাবতেও অবাক লাগে।

বেলকনির দরজা ঠেলে কেউ বাইরে এলো। ফায়জা আশা করছে অমর হোক। এন্ডি নিশ্চয় তাকে বলেছে ফায়জা এসেছে। ঘাড় ঘুরিয়ে যাকে দেখলো তাকেও যে একেবারেই আশা করেনি তাও নয়। এন্ডির মুগ্ধ দৃষ্টি নজরে না পড়ার কোন কারণ নেই। এন্ডি লুকিয়ে রাখার কোন চেষ্টাই করছে না। অন্য কেউ হলে হয়তো সে খানিকটা রাগই করতো। বন্ধুর হবু স্ত্রীর সাথে সখ্যতা করার চেষ্টা করাটা মোটেই ভালো লক্ষণ নয়। কিন্তু এন্ডির মুখের শিশুসুলভ হাসি দেখলেই রাগ উবে যায়।

এন্ডি মুখ ভর্তি হাসি নিয়েই বললো–আমি তোমাকে ডিস্টার্ব করছি না তো?

ফায়জা ঠোঁট টিপে হাসলো। –নাহ্! তোমাদের এপার্টমেন্টটা বেশ সুন্দর।

–আমাদের দু'জনার চলে যায়। তুমি তো বিয়ার খাও না। সফ্ট ড্রিংকস কিছু নিয়ে আসবো?

–লাগবে না। ওসব আমি তেমন একটা খাই না। আচ্ছা, অমর কোথায়?

–আছে । কেন, তোমার সাথে দেখা হয়নি?

–নাহ্ কোথাও।

–দেখবে। ব্যস্ত হবার কিছু নেই। এই সুযোগে দেখি আমি তোমার মন গলাতে পারি কিনা কিছু স্তোকবাক্য দিয়ে। তোমাকে ভয়ানক সুন্দর লাগছে এই পোশাকে। অমর যদি পথের কাঁটা না হতো তাহলে তোমাকে পাবার জন্য আমি জান বাজি রাখতাম।

ফায়জা হেসে ফেললো। –খুব পাজি হয়েছো তুমি এন্ডি!

–মাফ চাই কিন্তু নিজেকে সম্বরণ করবার উপায় আমার জানা নেই। তোমাকে দেখা অবধি আমার দুনিয়া ওলোট–পালোট হয়ে গেছে।

–এন্ডি, তোমার এই জাতীয় কথা শুনলে আমি খুব অস্বস্তি বোধ করি।

–যা সত্যি তা বলতে লজ্জা কি!

–দাঁড়াও, আমি অমরকে সব বলে দেবো।

–বলতেই হবে? এই ব্যাপারটা আমাদের দু'জনার মধ্যে গোপন রাখা যায় না? ধরে নাও আমি তোমার সিক্রেট এডমায়ারার।

ফায়জা হাসতে লাগলো। –এটাকে বলে সিক্রেট।

এন্ডিও তার সাথে গলা মেলালো।

ওদের দু'জনকে রীতিমতো চমকে দিয়ে হুড়মুড় করে বেলকনিতে এসে হাজির হলো অমর, তার বাহুসঙ্গী হয়ে আছে একটি সুন্দরী চাইনিজ আমেরিকান মেয়ে। অমরকে মাতাল মনে হচ্ছে। তার মুখে বিয়ারের গন্ধ। সে ফায়জার সামনে এসে দাঁড়ালো। –তোমাকেই খুঁজছিলাম ফায়জা।

এন্ডি এগিয়ে এলো। –অমর, তুমি মনে হচ্ছে একটু বেসামাল হয়ে আছো। পেটে মনে হয় একটু বেশীই পড়েছে।

অমর হাসলো। –জানোইতো, মদ জাতীয় জিনিসে আমার ভীষণ আসক্তি। মাতলামি আমার স্বভাব। ফায়জা, এ হচ্ছে ট্রেসি। ট্রেসি চ্যাং। ট্রেসি এই হচ্ছে ফায়জা।

ফায়জা হতভম্বের মতো অমর এবং ট্রেসির দিকে তাকিয়ে থাকলো। অমর যেভাবে ট্রেসিকে জড়িয়ে ধরে আছে তাতে তাদেরকে স্রেফ বন্ধু বলে মনে করা কঠিন। ট্রেসির অস্বস্তিও সহজেই নজরে পড়ে।

ট্রেসি কাঁপা কণ্ঠে বললো–তোমার সাথে পরিচয় হয়ে অনেক ভালো লাগলো ফায়জা। অমর তোমার কথা অনেক বলে।

ফায়জার মাথা ঝম্ ঝম্ করছে। সে কোনরকম বিড়বিড়িয়ে বললো–তাই নাকি?

অমর জড়ানো কণ্ঠে বললো –বলবো না কেন? আমরা হলাম বেষ্ট ফ্রেন্ড দু'জনে কত কি করেছি

ভুল করেছি ভালোবেসে

ফায়জার হৃৎপিণ্ডে হাতুড়ি পড়ছে। সে শুকনো কণ্ঠে বললো–অমর, তুমি ঠিক আছো তো?

অমর ট্রেসিকে টান দিয়ে ফায়জার মুখোমুখি এনে দাঁড় করালো।

–ও খুব সুন্দর, তাই না ফায়জা? আমি ওকে ভীষণ ভালোবাসি। আমরা আগামী বছর ঘর বাঁধার পরিকল্পনা করছি।

ফায়জার শরীর এবার দৃশ্যত কাঁপতে লাগলো। –কি বলছো এসব তুমি?

অমর শ্রাগ করলো। –আমার জীবন পাল্টে গেছে। এখন এই মেয়েটিই আমার সব। ওকে ছাড়া আমি আর কিছু ভাবতেই পারি না। সে ট্রেসিকে জড়িয়ে ধরে গভীর আবেশে চুমু খেলো।

ফায়জা সেই দৃশ্য দেখার জন্য দাঁড়ালো না। সে দৌড়ে বেলকনি থেকে এপার্টমেন্টের ভেতরে ঢুকলো। ছেলে মেয়েদের ভীড়ে জায়গাটা রমরমা হয়ে আছে। হৈ চৈ করে গল্প করছে তারা। কেউ কেউ বাজনার তালে তালে নাচছে। ফায়জার দিকে প্রায় কেউই ফিরে তাকালো না। তাদের ভীড় ঠেলে দরজার দিকে ছুটে গেলো সে।

এন্ডি মুহূর্তের হকচকিত ভাবটুকু কাটিয়ে উঠে ফায়জার পিছু নিলো। –এই ফায়জা, দাঁড়াও। যেও না।

এন্ডি চলে যাবার আগে এক মুহূর্তের জন্য থামলো। রাগ চোখে তাকালো অমরের দিকে। –এই হচ্ছে তোমার প্যান, হ্যাঁ। মাতাল হয়ে মেয়ে বন্ধুকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাওয়া? কি ধরনের অভদ্র তুমি?

অমরের অবাক হবার পালা। –ভুলটা কি করলাম? এটাই তো প্যান ছিলো।

–ওকে অপমান করবার তো কোন দরকার ছিলো না। বেষ্ট ফ্রেন্ড।

–তুমিইতো বলেছিলে এভাবে করতে!

–আমি তোমাকে মাতাল হতে বলিনি।

ট্রেসি অপরাধী কণ্ঠে বললো –ও খুব মন খারাপ করেছিলো। আমি এতো বিয়ার খেতে মানা করেছিলাম, শুনলো না আমার কথা।

–তা শুনবে কেন? বজ্জাত!

এন্ডি ... র দরজার দিকে এগিয়ে গেলো। –ফায়জা?

সে য... পৌঁছালো ফায়জা ততক্ষণে বেরিয়ে গেছে। করিডোরে বেরিয়ে এলো এন্ডি। ফায়জাকে কোথাও দেখা গেলো না। সে নিশ্চয় সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেছে। এন্ডিও সিঁড়ি ভেঙ্গে দৌড়ে নীচে নেমে এলো। এপার্টমেন্ট বিল্ডিয়ের পাশ দিয়েই চলে গেছে রাস্তা। রাস্তা সংলগ্ন ফুটপাথ। বেশ দূর থেকেও ফায়জাকে পরিষ্কার দেখতে পেলো এন্ডি। সে অসম্ভব জোরে ফুটপাথ ধরে দৌড়াচ্ছে। বোঝাই যাচ্ছে দৌড়াদৌড়িতে সে অভ্যস্ত নয়। হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবার সম্ভাবনা প্রচুর। এন্ডিও দৌড় দিলো। ফায়জাকে ধরতে তার বিশেষ অসুবিধা হলো না। ফায়জা ক্লান্ত হয়ে থেমে গেছে, হাপরের মতো শ্বাস নিচ্ছে। এন্ডিকে তার পাশে এসে থামতে দেখে আক্রমনাত্মক ভঙ্গিতে হাত ঝাপ্টা দিলো সে।

–ভাগো এখান থেকে। চলে যাও। যাও বলছি।

তার কণ্ঠস্বর ভেঙ্গে গেছে। সে যে কাঁদছে সেটা বুঝতে অসুবিধা হয় না। এন্ডি কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে থেকে ম্লান কণ্ঠে বললো–আমি শুধু তোমাকে ডর্ম পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসবো। কসম কাটছি, একটা কথাও বলবো না।

ফায়জা দম ফিরে পেয়েছে। তার দুচোখ বেয়ে অশ্রুর ধারা অঝোরে ঝরছে। সে মাথা নীচু করে হাঁটতে লাগলো। এন্ডি নীরবে তাকে অনুসরণ করলো। নিজেকে তার অসম্ভব অপরাধী মনে হচ্ছে। কিন্তু এই শোকতপ্তা মেয়েটিকে কি বলে সে সান্ত্বনা দেবে? কথাবার্তায় সে কখনই তেমন ভালো নয়। কিছু একটা বলাটা উচিৎ মনে হচ্ছে কিন্তু ভুল কিছু বলে মেয়েটির যন্ত্রণার উৎসে ঘা দিতেও সে চায় না। অনেক দ্বিধা দ্বন্দ্বের পরে সে মুখ বন্ধ রাখারই সিদ্ধান্ত নিলো।

প্রায় মিনিট পাঁচেক নীরবে হাঁটলো দু'জন। ফায়জার কান্নার প্রকোপ খানিকটা কমে এসেছে। সে ওড়না দিয়ে চোখ মুছলো।

–এন্ডি, কেন তুমি আমাকে এই কথা আগে বলোনি? জীবনে এমন ভয়ানক অপমান আমি কখনো হইনি।

এন্ডি নীচু গলায় বললো–বলতে তো চেয়েছিলাম; কিন্তু অমর মানা করলো। ও বললো ট্রেসির সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেই তুমি ব্যাপারটা ধরতে পারবে। মুখ ফুটে কিছু বলতে হবে না। আমরা দু'জনে মায়ের পেটের ভাইয়ের মতো। ওর কথা ফেলা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। পারলে আমাকে ক্ষমা করে দিও।

ফায়জা আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। –দেশে সবাই জানে আমরা দু'জন বিয়ে করতে যাচ্ছি। আমার বাবা মা খুব জাকজমক করে বিবাহ উৎসব করার পরিকল্পনা করছেন। কেন আমার স... লো ও?

... করেছিলাম। ও বললো ওর বাবা–মা যদি ট্রেসির কথা জানতে পারে তাহলে খুবই মর্মাহত হবে। এই জন্যেই ও দেশে কাউকে কিছু বলেনি। ভেবেছিলো তুমি তো পড়তে আসছোই। তোমাকে বুঝিয়ে বললে দুজনে মিলে তোমরা একটা অজুহাত বের করে বিবাহ ভেঙ্গে দেবে। তাহলে সব কুলই রক্ষা হবে।

–ওর বাবা-মা কষ্ট পাবে বলে ও আমার জীবনটা নিয়ে এইভাবে খেললো? আমার বাবা-মা যখন জানবে তখন তারা কতখানি কষ্ট পাবে ভেবে দেখেছো? খোদাই জানে এই খবর শুনলে বাবা বাঁচবেন কিনা।

–তাদেরকে ঝট্ করে কিছু না জানানোই বোধহয় ভালো। অবশ্য এটা তোমার ব্যাপার। কিন্তু আমি তোমাকে লজ্জার মাথা খেয়ে একটা কথা বলবো। অমর তোমাকে যতই অপমান কর ক তাতে তোমার কোন কিছুই ক্ষুন্ন হয়নি। তোমাকে মাত্র কয়েকদিন ধরে জানি তাতেই আমি তোমার বিশাল ভক্ত বনে গেছি। আমি নিশ্চিত তোমার ভক্তের দলে আমি একা নই। তোমার মতো সহজ, সরল মেয়ে এই পৃথিবীর জন্য এক অতুলনীয় পুরষ্কার। আর যাই করো, নিজেকে এক মুহূর্তের জন্যেও ছোট ভেবো না।

ফায়জা নিজেকে আর সামলাতে পারলো না। এই চরম অপমান এবং দুঃখের সময়ে এমন স্তুতি তার বেদনার বাঁধ যেন ভেঙ্গে দিলো। সে এন্ডিকে আলতো করে ধরে হু–হু করে কেঁদে ফেললো।

–আমার জীবনটা চিরকালের মতো পাল্টে গেলো। সারাটা জীবন ধরে একটা ছেলেকেই ভালোবেসেছি। অন্য কারো দিকে ফিরেও তাকাইনি। কেন আমার জীবনেই এমন হলো?

এন্ডি আলতো করে ফায়জাকে ধরে থাকে। মেয়েটির কান্না তাকেও প্রভাবিত করছে। তার নিজের চোখের কোণও ছলছল করছে। সে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রাখলো। ফায়জা এই দৃশ্য দেখলে বড় লজ্জার ব্যাপার হবে। পুর ষ মানুষের কান্না শোভা পায় না। ফায়জার এলোমেলো চুলের রাশি কোমল বাতাসে উড়ছে। হঠাৎ হঠাৎ তারা এন্ডির মুখ ছুঁয়ে দিচ্ছে। এন্ডির কাঁধে সেই স্পর্শ খুবই ভালো লাগছে। এই মেয়েটির সব কিছুই তার কাছে অসম্ভব ভালো লাগতে শুর করেছে।

পাঁচ

ফায়জার চোখে ঘুম নেই। গভীর রাতে সুমসাম প্রহরগুলি ধীরলয়ে গড়িয়ে চলছে সময়ের স্রোত ধরে। তার চারপাশে নেমে এসেছে রাতের স্বাভাবিক নিঃশব্দতা। ছেলেমেয়েরা সবাই ফিরে গেছে যে যার ঘরে। অধিকাংশই তলিয়ে গেছে ঘুমের শান্তিময় আঙিনায়। অনীতার হাল্কা নাক ডাকানির শব্দ শোনা যাচ্ছে। বিছানায় শুলেই ঘুমিয়ে পড়ে মেয়েটা। আজ রাতে সে খানিকটা মাতাল হয়েছিলো। রুমে ঢুকেই বিছানায় চলে গেছে। ফায়জার দূর্ভাগ্যের খবর হয়তো সে জানেও না। ফায়জা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়লো। অনীতার মুখোমুখি হতে চায়নি সে আজ রাতে। মেয়েটা ফিরে আসবার আগেই বিছানায় চলে গিয়েছিলো, ঘুমের ভান করেছিলো। অনীতা ওকে বিরক্ত করেনি। করবার মতো অবস্থাও ছিলো না। চোখ না খুলেই ফায়জা বুঝেছিলো অনীতা ফিরেছে।

ধীরে ধীরে বিছানা ছাড়লো ফায়জা। জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। তার মাথার মধ্যে নানান চিন্তার ঝড়। প্রাথমিক আঘাতের ধাক্কা কেটে গেছে কিন্তু সমগ্র অস্তিত্বে এক অসম্ভব ব্যথার উপস্থিতি, গলায় বিঁধে আছে কান্নার একটুকরো দলা, কিছুতেই সেটাকে সরাতে পারছে না সে। সবচেয়ে বড় চিন্তা তার বাবা-মাকে নিয়ে। দেশ থেকে যখন এসেছে তখনই বাবাকে নিয়ে তার দুঃশ্চিন্তা হচ্ছিলো। ভয়ানক মেয়ে অন্ত প্রাণ তার। মেয়েকে এতোদূর পাঠিয়ে থাকতে পারবেন তো? গতবার যখন মায়ের সাথে ফোনে কথা হয়েছিলো, শুনেছে বাবা খুব চুপচাপ থাকেন। কেউ কথা না বললে আলাপ করেন না। এমন শিশুর মতো একটা মানুষ। ফায়জার চোখ ফেটে আবার পানি গড়ায়। এই ঘটনা জানলে না জানি কি হয়। মা অনেক শক্ত। সবকিছুই সহজ ভাবে নিতে পারেন তিনি। অনেক ভেবে মাকে সব খুলে বলারই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ফায়জা। এমন ভয়ানক একটা ধাক্কা নিজের সবচেয়ে কাছের মানুষদের কাউকে না বলা পর্যন্ত তার হৃদয়ের বোঝা হালকা হচ্ছে না। তাছাড়া তাকে খুব বড় একটা সিদ্ধান্তও নিতে হবে। যার জন্যে এতো পথ ভেঙ্গে, বাবা-মাকে ফেলে এখানে এসেছিলো, সে যখন দূরে সরে গেছে তখন অযথা এই দূর ভূমিতে পড়ে থাকবার কি অর্থ? সে চোখ মুছে ফোনটা হাতে তুলে নিলো। টেবিল ল্যাম্পের আলোয় বাংলাদেশের তাদের বাসার নাম্বার ডায়াল করলো দ্রুতহাতে। কয়েক মুহূর্তের অপেক্ষার অবসান করে অন্য দিকে মায়ের কণ্ঠ শোনা গেল। ফায়জা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো। বাবা সকালে অফিসে যায়। সুতরাং তার বাসায় থাকার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। তারপরও বলা যায় না। হঠাৎ শরীর ভালো নেই, অফিসে যায় নি। ফোনের রিং শুনলেই বোঝা যায় বিদেশ থেকে এসেছে। বাবা বাসায় থাকলে ঝাঁপ দিয়ে ধরতো।

মায়ের গলা শোনা যাচ্ছে। -ফায়জা? ফায়জা, কথা বলছিস না কেন? ফায়জা, আমি তোর কথা শুনতে পাচ্ছি না।

ফায়জা ডুকরে কেঁদে উঠলো। -মা!

ক ভুল করেছি ভালোবেসে ান্তে। -কি হয়েছে রে, ফায়জা?

মায়ের গলা শান্ত। মা জানে কখন উত্তেজিত হতে হয়, কখন হয় না। ফায়জার মনে হয় তার মা পাশে থাকলে যাবতীয় দুঃখ সে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতে পারতো।

মা আবার বললেন-কি হয়েছে মা? বল আমাকে।

-অমর বিয়ে ভেঙ্গে দিয়েছে, মা। ও অন্য একজনকে পছন্দ করে।

মা কিছুক্ষণ নিঃশব্দ থাকলেন। এমন একটি সংবাদের জন্য তিনি যে প্রস্তুত ছিলেন না তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। তিনি অবশেষে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপার চেষ্টা করে বললেন-তাতে কি হয়েছে? তুই পড়তে গেছিস, পড়া শেষ কর। অমন কত ছেলে তোর পায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়বে। আমার জন্য একচলিশটা বিয়ের প্রস্তাব এসেছিল! তোর জন্যে একান্নটা আসবে।

ফায়জা কাঁদতে কাঁদতে হেসে ফেললো। -মা! প্রস্তাবের কথা উঠছে কেন!

—বাদ দে ও কথা। এতো কাঁদছিস কেন তুই? এমন ঘটনা কি শুধু তোর বেলাতেই ঘটলো? সহজভাবে নে। তুই শক্ত মেয়ে। এতো অল্পে ভেঙ্গে পড়লে চলবে কেন?

মায়ের কথায় বিশেষ জোর পেলো না ফায়জা। সে চাপা কণ্ঠে বললো —আমি দেশে ফিরে আসতে চাই, মা।

মা আবার কয়েকটা মুহূর্ত চুপ করে থাকলেন। যখন কথা বললেন তার কণ্ঠের উত্তেজনাটুকু ঢাকা পড়লো না। —আমার বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে। তুই আমেরিকা যাবার আগে ওর বাবা-মায়ের সাথে আমরা খোলাখুলিভাবে আলাপ করলাম। তাদেরকে দেখে তো মনে হলো না তারা কিছু জানেন। কেমন অপমানের ব্যাপার হবে বুঝতে পারছিস? আমারই কেমন শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

বাইরের শক্ত আবরণের নীচে মায়ের কোমলতা পরিস্ফুটিত হয়ে উঠছে। ফায়জা সামাল দেবার চেষ্টা করলো। —মা, এখন তোমাকে শক্ত হতে হবে, বাবাকে ঘূণাক্ষরেও কিছু জানতে দিও না।

—সেটাতো চিন্তারও বাইরে। কিন্তু অমরকে আমরা এতো ভালো ছেলে বলে জানতাম। কিভাবে এমন একটা ভয়ংকর কাজ করতে পারল সে?

—জানি না মা। আমার মাথায় কিছুই ঢুকছে না। আমি শুধু দেশে ফিরে আসতে চাই। এই অপমানের [illegible] খানে আর একটা দিনও আমার পক্ষে থাকা সম্ভব নয়।

মা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লেন। —তোর যন্ত্রণা আমি বুঝতে পারছি, মা। ওখানে তো আর কেউ নেইও যে মন খুলে দুটো কথা বলবি। যদি বেশী কষ্ট হয় তাহলে চলে আয়। তোর বাবাকে যা হোক কিছু একটা বুঝিয়ে বললেই হবে। তোর কাছে টিকিটের টাকা আছে তো? না থাকলে বল, আমি আজই পাঠিয়ে দিচ্ছি। ফায়জা, আবার কাঁদছিস নাকি, মা? কাঁদিস না। আমাকে শক্ত হতে বলছিস, তুই নিজেই শক্ত হ।

ফায়জা শক্ত হবার প্রশ্নে আবার ভেঙ্গে পড়ে। কত স্বপ্ন নিয়ে অমরের কাছে এসেছিলো সে। এমন নিদারুণ আঘাতে সব ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেলো। দেশে ফিরে গেলেও কি লজ্জায় মুখ দেখাতে পারবে। দুদিন বাদে সবাই সত্য জানবেই। সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। মায়ের কণ্ঠের উত্তাপ তার হৃদয়ে কোমল এক প্রলেপ বুলিয়ে যায়।

অনীতার ঘুম ভেঙ্গে গেছে। অমরের কাণ্ডের কথা সে পার্টিতেই শুনেছে। শোনার পরপরই ফায়জার খোঁজ করে। তাকে কোথাও না দেখে ফিরে আসে ডর্মে। ফায়জা ঘুমের ভান করে শুয়েছিলো, তার চোখে অশ্রুর রেখা নজরে এড়ানোর কথা নয়। অনীতা তাকে বিরক্ত না করে চুপচাপ বিছানায় চলে গেছে। বেশ কয়েকটা বিয়ার পড়েছিলো পেটে, কখন ঘুম চলে এলো জানতেও পারেনি। এমন গভীর রাতের নিঃশব্দতায় খুব প্রিয় এক বান্ধবীর কান্নার বেদনাময় শব্দ তার হৃদয়ে শূলের মতো বিঁধছে। তার ইচ্ছে হচ্ছে এখনই ছুটে গিয়ে অমরের দুই গালে কষে থাপ্পড় দেয়। বদমাশ!

পরপর কয়েকদিন ক্লাশে ফায়জাকে না দেখে এন্ডি দুঃশ্চিন্তায় পড়ে গেলো। অনীতারও দেখা নেই যে তাকে জিজ্ঞেস করবে। ফোন নাম্বার জোগাড় করে ফায়জার ডর্মে বেশ কয়েকবার রিং করেছে সে। কেউ ধরে না। আনসারিং মেশিন বোধহয় অকেজো করে রাখা, কারণ ফোন বেজেই চলে। অমরের সাথে এই ব্যাপারে আলাপ করা অর্থহীন। সেদিনের পর সে নিজেও বেশ বিব্রতকর অবস্থায় রয়েছে। অনেকেই ব্যাপারটা ভালো চোখে দেখেনি। বাসায় ফিরলেই তাকে অর্ধ মাতাল অবস্থায় দেখে এন্ডি। বাধ্য হয়ে ফায়জার ডর্মে হানা দেবারই সিদ্ধান্ত নিলো সে। আর কিছু না হোক এমন একটা ঘটনার পর মেয়েটা কেমন আছে খোঁজ করাটা যে কোন পরিচিতের জন্যই স্বাভাবিক। ফায়জা নিশ্চয় রেগে যাবে না। বিশেষ করে রাতে ফায়জাকে ডর্মে পৌঁছে দিতে এসে সে যেন মেয়েটাকে আরো বেশী করে অনুভব করতে শুরু করেছে। ওর

কোমল চুলের রাশি তার মুখে খেলে বেড়িয়েছিলো, ওর শরীরের হালকা সুগন্ধে এন্ডির বুক ভরেছিলো। সে রাতের সেই সামান্য নৈকট্যতাটুকুর কথা এন্ডি কিছুতেই ভুলতে পারছে না।

ফায়জার ডর্ম খুঁজে পেতে বিশেষ বেগ পেতে হলো না। দরজায় টোকা দিতে অনেক সাহস সঞ্চয় করতে হলো এন্ডিকে। সামান্য ভালো লাগা মানুষকে কতখানি দুর্বল করে দিতে পারে ভেবে নিজেই আশ্চর্য হয় এন্ডি। পরপর দু'বার টোকা দিলো সে। অপেক্ষা করতে লাগলো, ভেতরে মানুষের পদশব্দ শোনা যাচ্ছে। অনীতা না থাকলেই হয়। মেয়েটার ক্ষুরধার জিহ্বা আর বাঁকা কথাবার্তাকে খুব ভয় পায় এন্ডি। অমরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু সে। হাতের কাছে পেলে তাকেই চড়-থাপ্পড় মেরে দেয়াটা অসম্ভব নয়।

দরজার পাশে এসে থমকে দাঁড়ালো পদধ্বনিটা। নিশ্চয় 'আই-হোলে' চোখ রেখে আগন্তুককে দেখছে। প্রায় নিঃশব্দে দরজা খুলে গেলো। ফায়জা। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো এন্ডি। অনীতাকে কোথায়ও দেখা যাচ্ছে না।

সে বোকার মতো এক টুকরো হাসি দিলো। -ভেতরে আসতে পারি? ফায়জা নিরাসক্ত দৃষ্টিতে তাকে পর্যবেক্ষণ করলো। শেষ পর্যন্ত শ্রাগ করে দরজা থেকে সরে দাঁড়ালো সে। -এসো।

এন্ডি ভেতরে ঢুকে দরজাটা ভিড়িয়ে দিলো। কামরার ভেতরটা প্রচণ্ড অগোছালো হয়ে আছে। বোঝাই যায় গত কয়েকদিনে এর মধ্যে কোন গোছানোর উদ্যোগ নেয়া হয়নি। চারিদিকে ব্যবহৃত জামা-কাপড়, বিছানাপত্র। কামরার দু'টি চেয়ারও কাপড়ে সম্পূর্ণ ঢেকে আছে।

ফায়জা তাকে অবাক দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকাতে দেখে একটু লজ্জাই পেলো। -হ্যাঁ, জঙ্গল হয়ে আছে ঘরটা। বুঝতেই তো পারছো আমার মনের অবস্থা। অনীতা কখনই কিছু গোছায় না।

সে দ্রুত হাতে একটা চেয়ার থেকে কাপড়-চোপড় সরিয়ে এন্ডির বসার স্থান করে দিলো।

-সফ্‌ট ড্রিংস কিছু খাবে?

এন্ডি আড়ষ্ট ভঙ্গিতে চেয়ারে বসলো। -না, না। তুমি কেমন আছো সেটা দেখার জন্যই এলাম। কতবার ফোন করেছি। তুমিতো ফোন ধরই না।

-ফোন করেছিলে কেন?

-তোমার জন্য চিন্তা হচ্ছিলো। গত ক'দিন ধরে ক্লাসেও আসোনি।

-কি হবে আমি দেশে ফিরে যাচ্ছি।

এন্ডি স্পষ্টতই চমকালো-কি? তোমার মতো অপরূপ সুন্দরী একটা মেয়ে চাইলে যে কোন ছেলেকে বাগাতে পারে। অমরের জন্য তুমি সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে চলে যাবে? ভুলে যাও ওর কথা। তুমি তোমার পথে চলে যাও। কে মনে রাখে এসব?

ফায়জা শান্ত কণ্ঠে বললো -সেটাইতো করছি। আমি আমার পথে চলে যাচ্ছি।

-দেশে ফিরে গিয়ে?

-নিশ্চয়। সেখানেই তো আমার জীবন। আমার বাবা-মা, ঘর-বাড়ি, বন্ধু-বান্ধব। সবাইকে ফেলে এখানে এসেছিলাম অমরের জন্য। কারণ ভেবেছিলাম ওর সাথে আমার জীবন জড়িয়ে যাবে। তা তো আর হলো না। অযথা এখানে পড়ে থেকে কেন জীবনটাকে নষ্ট করবো?

এন্ডির মন খারাপ হয়ে গেছে। সে চেষ্টা করেও সেটা ঢাকতে পারলো না। -আবেগের বশে কিছু করোনা। একটু সময় নাও।

–এই অপমানের পর এখানে থাকাটা আমার পক্ষে কোন মতেই সম্ভব নয়। তাছাড়া এখন বাবা–মায়ের সাথে থাকলেই সবচেয়ে ভালো লাগবে। আলাহ্ জানে, বাবা যখন জানবেন তখন তার কি অবস্থা হবে। এখনও তাকে কিছুই জানানো হয় নি।

ফায়জা নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলো। –আমার বাবার যদি কিছু হয় তাহলে অমরকে আমি কোনদিন ক্ষমা করবো না।

এন্ডিকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে দৌড়ে বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলো ফায়জা। এন্ডি বোকার মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলো। শেষ পর্যন্ত চলে যাবারই সিদ্ধান্ত নিলো ও। গলাটা একটু চড়িয়ে বললো–কোন দরকার হলে আমাকে ডেকো। যে কোন দরকার।

ফায়জা কোন উত্তর দিলো না। এন্ডি ধীর পায়ে বাইরের করিডোরে বেরিয়ে এলো। তার রীতিমতো কান্না পাচ্ছে। বিশ্বাসই হচ্ছে না খুব শীঘ্রিই অনেক দূরে চলে যাবে ফায়জা। সে আপন মনে মাথা নাড়ে। এটা কোন কাজের কথা হলো না। এমন অসম্ভব ভালো একটি মেয়ে এতোখানি বেদনা নিয়ে পৃথিবীর দূর এক প্রান্তে হারিয়ে যাবে ভাবতেও খারাপ লাগে। কিন্তু তারই বা কি করার আছে। সে তো আর কেউ নয়।

ছয়

এ[illegible] কোন কিছুই আর বাধা মনে হয় না। ফায়জারও তাই হয়েছে। দেশে ফেরাটা স্থির হতেই বাকি কাজটুকু ঝট্ করে হয়ে গেলো। তার কাছে টিকিটের টাকা ছিলো না, মা পাঠিয়ে দিয়েছেন। টাকাটা পৌঁছাতেই টিকিট কেটে ফেলেছে ফায়জা। এখানে প্রয়োজনের চেয়ে একদিনও বেশী থাকার ইচ্ছে নেই ওর। এই সময়টাতে বেশ ব্যস্ততা থাকে, তাড়াতাড়ি কোন ফ্লাইট পায়নি ও। ইচ্ছা না থাকলেও বেশ কয়েকটা দিন এখানে থাকতেই হবে। ক্লাশে সে আর যায় না। দরকারও দেখে না। দেশে ফিরে কোথাও ভর্তি হয়ে যাবে। একটা সেমিষ্টার নষ্ট হলো, তাতে কি? অধিকাংশ সময় ডর্মেই কাটায়; বান্ধবীদের সাথে গল্প করে নইলে গল্পের বই পড়ে; মাঝে মাঝে টিভি দেখে। সময় কেটে যাচ্ছে। বিকেল বেলাটা চমৎকার রোদ ওঠে। কখনো কখনো ডর্ম থেকে বেরিয়ে এসে অনতিদূরে সবুজ ঘাসের উপর বসে পড়ে। দেশ থেকে বেশ কিছু গল্পের বই এনেছিলো। অধিকাংশই পড়া হয়ে গেছে। আবার পড়ে। সময়তো কাটাতে হবে।

এন্ডি মাঝে মাঝে ফোন করে। অধিকাংশ সময়েই ধরে না, মাঝে মাঝে ধরে। বেচারা খুব মন খারাপ করেছে। একেই বলে প্রহসন। যাকে সে এতো ভালোবেসেছিলো সে অন্য একজনের হাত ধরে তাকে ছেড়ে গেলো, আর কোত্থেকে এই ছেলেমানুষটা দু'দিনের পরিচয়ে প্রেমে পাগল হয়ে পড়েছে। এন্ডির জন্য ফায়জার একটু খারাপই লাগে। এমন সুদর্শন, ভদ্র একটা ছেলে! অন্য পরিস্থিতিতে দেখা হলে আগ্রহী হয়ে না উঠবার কোন কারণ ছিলো না তার। কিন্তু এই মানসিকতায় ওসব কথা ভাবতেও তার ইচ্ছে হয় না। কে জানে কার মনে কি আছে? তাছাড়া এন্ডিকে সে কতটুকুইবা চেনে? যতখানি না বিব্রতকর অবস্থায় পড়বার ভয়ে তারচেয়ে বেশী এন্ডির ভয়েই ক্লাশে যাওয়া একেবারেই বন্ধ করেছে ও। অনীতা ওকে ভর্ৎসনা করে। দেশে যাবে যাও, কিন্তু স্কুলে গিয়ে হৈ চৈ করে একটু আনন্দে থাকতে অসুবিধা কোথায়? অসুবিধা আছে। এন্ডি সারাক্ষণ তাকে খোঁজে। এই শেষ সময়ে অন্য কোন ঝামেলায় সে জড়াতে চায় না।

কিন্তু জড়াবে না বললেও কি রক্ষা আছে? বিকালে ঘেসো মাঠে হালকা রোদ্দুরে বসেছিলো ফায়জা, হনহন করে হেঁটে এসে হাজির হলো এন্ডি। লুকানোর উপায় নেই। বাধ্য হয়েই বই থেকে মুখ তুলতে হয় ফায়জাকে।

–কেমন আছো এন্ডি?

এন্ডি শ্রাগ করে। তার মুখে স্পষ্ট অভিমান। –সত্যিই আমাদেরকে ছেড়ে চলে যাচ্ছো তুমি? অমর জানলোও না কি বস্তু হেলায় হারালো সে।

–সে নিশ্চয় আরো ভালো কাউকে পেয়েছে।

–তোমার চেয়ে ভালো আর কে হবে?

–তুমি আমার সম্বন্ধে সব সময় বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলো। আমি আর দু' দশটা মেয়ের মতই।

–সব মেয়েই যদি তোমার মতো সুন্দর হতো আর অমন মধুর করে হাসতো তাহলে দুনিয়াটাই স্বর্গ হয়ে যেতো। যাই হোক, অনীতা বলছিলো আগামী বুধবারে তোমার ফ্লাইট?

–হ্যাঁ। রাতে।

এন্ডি কিছুক্ষণ চুপচাপ করে থেকে বললো–তোমাকে যেতে দিতে ইচ্ছে হয় না। কিন্তু আমাদের জন্য তুমি থাকবেই বা কেন? যাই হোক, নিদেনপক্ষে তোমাকে বিদায় দেবার সুযোগটা দাও। তোমাকে আমি এয়ারপোর্টে নামিয়ে দিতে চাই, যদি তোমার আপত্তি না থাকে।

বেচারার মুখ দেখে ফায়জার মন গলে গেলো। সে অসহায় ভঙ্গিতে বললো –যদি জোর কর তাহলে আর মানা করবো কিভাবে।

–জোরই করছি। এইটুকু করতে পারলে অনেক ভালো লাগবে আমার। এটাই হয়তো আমাদের শেষ বিদায় হবে। কোথায়, কত দূরে চলে যাবে তুমি।

ফায়জা এন্ডির পিঠে আলতো করে হাত ঘষে দেয়। বন্ধুত্বের চিহ্ন।

–এভাবে বলো না। কার সাথে কার কখন আবার দেখা হয়ে যায় কে বলতে পারে। দুনিয়াটা বেশী দূর নয়, জানোই তো?

–তোমাকে আমি খুব মিস্ করবো।

–আমিও তোমাদের সবাইকে মিস্ করবো। বিশেষ করে তোমাকে, তোমার মতো এতো ভালো ছেলে খুব কমই হয়।

–হ্যাঁ, ভালো না ছাই। ভালো হলে এভাবে পায়ে ঠেলে চলে যেতে না। যাই হোক, পিঠে তোমার হাতের ছোঁয়াটা ভালোই লাগছে। থেমো না।

ফায়জা হেসে ফেললো। বেশ জোরেসোরেই এন্ডির পিঠে একটা কিল বসিয়ে দিলো। –অসভ্য! আরেকটা কিল দেবো!

–দাও, তোমার লাথি খেলেও জীবন ধন্য। দাও নিতম্বে একটা কষিয়ে।

ফায়জা ভুল করেছি ভালোবেসে লো। এন্ডিকে দেখে বোঝাই যায় না মাঝে মাঝে ও এমন মজা ক

রাতে ডর্মে ফিরে অন্ধকার ঘরে কিছুক্ষণ নিঃসাড়ে শুয়ে থাকলো ফায়জা। অনীতা এখনো ফিরেনি। তার কোন সময়ের হিসেব নেই। কখনো মাঝরাতে ফেরে, কখনো ভোর করে। বিশেষ করে ফায়জা যখন থেকে দেশে যাওয়া মনস্থ করেছে, তখন থেকে মেয়েটা যেন ইচ্ছে করেই ওকে অবহেলা করার চেষ্টা করছে। ফায়জা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে। মাত্র এই ক'দিনেই এতোগুলো চমৎকার বন্ধু পেয়েছিলো ও! ফিরে যেতে কষ্টই হচ্ছে।

ফোনটা বাজছে। এন্ডি? ধরবে না ধরবে না করেও ধরলো। অমরের কণ্ঠ শুনে যতখানি চমকাবে ভেবেছিলো ততখানি চমকালো না। কেন যেন মনে হচ্ছিলো ও চলে যাবার আগে অমর ওর সাথে অন্ত‌ত একবার কথা বলার চেষ্টা করবে। কত সুখ–দুঃখের স্মৃতি জড়িয়ে আছে ওদের দু'জনার অতীতকে ঘিরে। ঝট্ করে সব কি কেউ ভুলে যেতে পারে?

অমর বললো–ফায়জা, আমাকে কখনো ক্ষমা করতে পারবে?

ফায়জা চুপিসাড়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লো। –যা তোমার দরকার নেই তা চেও না।

–তোমার ক্ষমা আমার দরকার। সত্যিই দরকার। ট্রেসির কথা তোমাকে আরো অনেক আগেই বলা উচিৎ ছিলো। আমি একটা কাপুরুষ!

–তোমার উপর আমার কোন রাগ নেই।

–তুমি ফিরে যাবার আগে একবার দেখা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সাহসে কুলালো না।

–আমাকে নিয়ে ভেবো না। আমি ভালোই থাকবো। রাখি।

–আচ্ছা।

ফোন রেখে দিয়ে বিছানায় নিঃশ্চুপ কয়েকটা মুহূর্ত বসে থাকলো ফায়জা। অনেক চেষ্টা করেও উদগত অশ্রু আটকানো গেলো না। হাটুতে মুখ গুজে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলো ও। কেন এতো কষ্ট হয়?

সাত

দেখতে দেখতে কয়েকটা দিন কেটে গেলো। আজকে ফায়জার ফ্লাইট। গোছগাছ যা করার আগেই সেরে রেখেছিলো ও। যে ধরনের পরিস্থিতিতে ফিরে যেতে হচ্ছে তাতে কারো জন্য গিফ্‌ট কেনার মতো মন মানসিকতা থাকার কথা নয়, তবুও ও বাবা–মার জন্য এটা সেটা কিছু কিনেছে। ছোট ছোট কয়েকটা খালাতো ভাইবোন আছে, ফায়জা আপু বলতে তারা অজ্ঞান। তাদের জন্যও খুঁজে খুঁজে কিছু খেলনা নিয়েছে। অনীতা সকালে উঠেই অনেকক্ষণ মুখ গোমড়া করে বসে থেকেছে। গত কয়েক দিনে তার রাগ খানিকটা কমেছে। অভিমান এখনো আছে কিন্তু কথা বার্তা বলছে। এমনকি ফায়জার সাথে এয়ারপোর্টেও যেতে চেয়েছে। ফায়জা আপত্তি করেছিলো কিন্তু কিছুতেই শুনবে না।

ফায়জার ধারণা মেয়েটার এক ঢিলে দুই পাখী মারার ইচ্ছা। ফায়জাকেও বিদায় দেয়া হলো, এন্ডির সাথেও খানিকক্ষণ ঘনিষ্ঠভাবে থাকা গেলো। ও আপত্তি করেনি। এন্ডিকে কিছু বলেনি। অগ্রীম জানলে হয়তো বেঁকে বসতে পারে। মেয়েটার প্যান নষ্ট হবে। দুপুরে একটা ক্লাশ আছে অনীতার। ও যাবার আগে বলে গেছে যত তাড়াতাড়ি পারে ফিরে আসবে। ফায়জাদের রওনা দেবার কথা বিকাল তিনটার দিকে, তার আগেই ও ডর্মে চলে আসবে। তাকে ছেড়ে যেন ফায়জারা চলে না যায়।

কথা রাখা সম্ভব হলো না। তিনটার মধ্যে যখন অনীতা ফিরলো না, এন্ডি রওনা দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লো। অনীতা সাথে যাবে শুনেই সে স্পষ্টতই বিরক্ত হয়েছিলো। কিন্তু ফায়জা জোর করে বলায় বিশেষ আপত্তি করতে পারেনি; কিন্তু তিনটা পর্যন্ত ডেড লাইন দিয়েছিলো। বোস্টন পর্যন্ত যেতে সময় লাগবে। রাস্তায় ভীড় থাকলে সর্বনাশ হবে। কথাটা মিথ্যে নয়। বাধ্য হয়ে বের হতে হলো ফায়জাকে। অনীতা নিশ্চয় ক্লাশে আটকে গেছে। সেলফোনে ফোন করেও পাওয়া যাচ্ছে না। নিশ্চয় ফোন অফ করে রেখেছে। ওর বাক্স পেটরা ঝট্‌পট গাড়ীতে তুলে ফেললো এন্ডি। রওনা দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে সে। তার তড়িঘড়ি দেখে ভালোই লাগছে ফায়জার। মনে মনে যেতে দিতে চায় না কিন্তু আবার পেন ধরতে দেরী হবার ভয়ে তটস্থ হয়ে আছে। ভালোই ছেলেটা। একটা সুন্দর সারল্য আছে। গাড়ী ছেড়ে দেবার পর আবার ফোনে অনীতাকে ধরার চেষ্টা করলো ফায়জা। এবার পাওয়া গেলো। –অনীতা! কোথায় তুমি?

–আরে, এখনো ক্লাশে। ফিসফিস করে কথা বলছে অনীতা। –তোমার ফোন এসেছে বুঝতে পারছি কিন্তু ধরতে পারছি না। রিং ভাইব্রেশনে দিয়ে রাখা। ঠিক সামনেই দাঁড়িয়েছিলো টিচার। কথা নেই বার্তা নেই একটা টেস্ট নেবার শখ হয়েছে তার। এই যাহ, দেখে ফেললো মনে হয়। যাই। ভুল করেছি ভালোবেসে এয়ারপোর্টে চলে আসবো।

–সত্যিই আসবে?

–কথা দিলাম। ছাড়ি এখন। প্রফেসর সাহেব কটমট করে তাকিয়ে আছে।

ফায়জা হাসতে হাসতে বললো–রাখি তাহলে।

এন্ডি মনোযোগ দিয়ে গাড়ী চালাচ্ছিলো। জানতে চাইলো–ও আসবে?

–হ্যাঁ। ক্লাশের পরে সরাসরি এয়ারপোর্টে চলে যাবে।

–বাঁচা গেছে। ওর বকবকানি শুনতে ভালো লাগে না।

–ও কিন্তু আসলে খুব ভালো মেয়ে। তুমি ওকে বোঝার চেষ্টাই করো না।

–ওর কথা থাক। লাঞ্চ করেছো তুমি?

–অল্প–সল্প। ক্ষিধে ছিলো না।

–আসার সময় সফ্‌ট্ ড্রিংক্স কিনেছিলাম। খাও। যেতে ঘন্টা খানেকের উপর লাগবে।

গাশ হোল্ডারে বিশাল দুই গাশ ভর্তি কোক।

ফায়জা শ্রাগ করলো। –আমি কোক খুব একটা খাই না।

এন্ডি তার নিজের কোকে একটা সিপ দিয়ে খেলো –এখনো সময় আছে ফায়জা। যেওনা। আমি তোমার ক্রীতদাস হয়ে থাকবো।

ফায়জা হেসে ফেললো। –আবার শুরু হলো? দাস–দাসী আমার পছন্দ না।

–আমাকে তো পছন্দ, ঠিক কি না?

কৃত্রিম রাগ দেখালো ফায়জা। –শুধু ফাজলমি! চোখজোড়া দয়া করে রাস্তার দিকে রাখো। সুস্থভাবে এয়ারপোর্ট পৌঁছাতে চাই। আমি বরং এই ফাঁকে কোকটাই সাবাড় করি।

ফায়জা গভীর মনোযোগ দিয়ে কোক খেতে থাকে। দৃষ্টি বাইরে। এন্ডির সাথে এই সমস্ত আলাপ শুরু করতে চায় না সে। কখন কার প্রতি মানুষের দুর্বলতা তৈরি হয়ে যায়, তার কি কোন ঠিক আছে? এই শেষ মুহূর্তে কোন পিছুটান রাখার অর্থ হয় না। কিন্তু এন্ডি চুপ করে থাকে না।

–জানলে না, কি স্বর্গীয় প্রেম পিছে ফেলে যাচ্ছো। এখনো সময় আছে। ভেবে দেখো। তোমার ভালোবাসায় উন্মত্ত এই উন্মাদকে পিছে ফেলে রেখে যেও না।

–কোনরকম উন্মাদনা করার চেষ্টা করলে পিটিয়ে তক্তা বানাবো। ফায়জা হাসতে হাসতে বললো।

–বানাও। তক্[illegible] নিয়ে যেতে ভুলো না। সুভেনির।

–আমার সুভেনিরের দরকার নেই। তোমাকে তো নয়ই।

এন্ডি হতাশ ভঙ্গি করলো। –এই হতভাগা যেদিকে তাকায় সেদিকে সাগর শুকায়।

হাসি সামলানো গেলো না। বিষম খেয়ে কাশতে লাগলো ফায়জা।

হাইওয়ে ৯৩'র সাইন দেখা যায়। ৯৩ সাউথ চলে গেছে বোস্টনে, ৯৩ নর্থ নিউ হ্যাম্পশায়ারে। এন্ডি ৯৩ নর্থ নিলো। ফায়জার বোধহয় ভালো ঘুম হয়নি রাতে। ভীষণ ঘুম ঘুম লাগছে ওর। কিন্তু তারপরও এন্ডির ভুলটা ওর নজর এড়ালো না। –আমাদেরকে তো সাউথ নিতে হবে।

–নর্থ নিয়ে অন্য একটা রাস্তা ধরা যায়। ভীড়টা কম হবে। অফিস ফেরত ট্রাফিকে পড়লে সর্বনাশের ষোল কলা পূর্ণ হবে।

–এই এলাকা তুমিই ভালো চেনো। আমার খুব ঘুম ঘুম লাগছে। আমি একটু ঘুমিয়ে নেই।

–ঘুমাও। এয়ারপোর্টে পৌঁছে তুলে দেবো।

ফায়জা সিটে হেলান দিয়ে শরীরটা এলিয়ে দেয়। দেখতে না দেখতে গভীর ঘুমে তলিয়ে যায় সে।

অনীতা ক্লাস শেষ হতেই গাড়ী নিয়ে হাইওয়েতে উঠেছে। ঝুঁকি নিয়ে স্পীড লিমিটের চেয়ে বেশ জোরেই চালিয়েছে। কপাল ভালো কোন জ্যামে আটকিয়ে যায় নি। ফ্লাইট ছাড়ার আধ ঘন্টা আগেই এসে এয়ারপোর্ট পৌঁছালো ও। ফায়জা নিশ্চয় ওর সাথে দেখা না করে বোর্ডিংয়ে যাবে

না। একরকম দৌড়ে এয়ারপোর্টের ডিপার্চার লাউঞ্জে এসে ঢুকলো ও। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হলো অনেক খুঁজেও ফায়জাকে কোথাও দেখলো না ও। এন্ডিরও কোন হদিস নেই। সেলুলারে ফায়জাকে ধরার চেষ্টা করেও কোন লাভ হলো না। ফোন বাজছে কিন্তু কেউ ধরছে না। টিকিট কাউন্টারে এক বয়সী মহিলাকে বিশেষ করে অনুরোধ করতে সে রেকর্ড দেখে জানালো ঐ নামের কেউ এখনো বোর্ডিং পাস নেয়নি। অনীতার মাথায় বাজ পড়লো। এটা কি করে সম্ভব? কোন ঝামেলায় পড়লো না তো ওরা? কি করবে, কাকে ডাকবে? শেষ পর্যন্ত অমরকেই ফোন করলো। ভাগ্য ভালো তাকে পাওয়া গেল।

–হ্যালো? অমরের কণ্ঠ।

–অমর, অনীতা বলছি। আমি লোগান এয়ারপোর্টে। ফায়জাকে বিদায় জানাতে এসেছিলাম। ওর ফ্ল আধ ঘন্টা বাকী অথচ ও এখনো এসে পৌঁছায়নি। আমার খুব চি

–কি বলছো তুমি? এন্ডির না কথা ছিলো ওকে এয়ারপোর্টে নিয়ে যাবার?

–তার সাথেই তো রওনা দিয়েছিলো, তিন ঘন্টা আগে। গাড়ী থেকে আমাকে ফোন করেছিলো। পুলিশকে ফোন করবো? খোদা না করু ক, কোন খারাপ কিছু ঘটেনি তো?

অমর একটু চিন্তা করে বললো–ওখানে থাকো। আমি আসছি।

–তাড়াতাড়ি আসো। আমার কেমন যেন মাথা খারাপ লাগছে।

অমর ফোন রেখে দিলো। অনীতা ছটফট করতে করতে চারিদিকে ফায়জাকে খুঁজতে লাগলো।

অমরের পৌঁছতে ঘন্টাখানেক লেগে গেলো। অনীতাকে সে লবিতেই চোখ মুখ অন্ধকার করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলো।

–পৌঁছেছে ওরা?

অনীতা ঘাড় নাড়লো। –নাহ্। পুলিশে খবর দিয়েছো তুমি?

–হ্যাঁ। এই এলাকায় কোন দূর্ঘটনার কথা ওদের জানা নেই।

–প্যাসেঞ্জাররা সবাই পেনে উঠে গেছে। যে কোন সময় ছেড়ে দেবে পেন। কি কারণে যেন দেরী হলো ফ্লাইটের। ফায়জা পেন মিস্ করলো।

অমর চিন্তিত ভঙ্গিতে বললো–কোন সমস্যা হলে এন্ডি আমাকে নিশ্চয় ফোন করতো। ও জানে আমি সব সময় সাথে সেল রাখি।

–কি করবে এখন?

–অপেক্ষা করতে হবে। যাই ঘটে থাক ওরা আমাদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করবেই।

–মিসিং বলে রিপোর্ট করলে কেমন হয়?

–এতো শীঘ্রি সেটা করা যাবে না। ৪৮ ঘন্টা অপেক্ষা করতে হয় মনে হয়।

–খোদা! আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না। কোথায় গেলো ওরা?

আট

ফায়জার যখন ঘুম ভাঙলো তখন সন্ধ্যা। ওর মাথাটা এখনো ঝিম্ ঝিম্ করছে। গাড়ী এখনো ছুটছে। সে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে চারিদিকে চোখ বোলালো।

–কোথায় আমরা?

–এই তো প্রায় পৌঁছে গেছি। এন্ডি শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিলো।

–কোথায়? খুব মাথা ধরেছে আমার। বমি বমি লাগছে। আমার ড্রিংকসে কিছু মিশিয়ে দিয়েছিলে তুমি?

এন্ডি প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলো। –আরেকটু ঘুমিয়ে নাও। ভালো লাগবে।

–আমরা লোগান এয়ারপোর্টে যাচ্ছি না, ঠিক কিনা? এন্ডি, আমরা কোথায় চলেছি?

ফায়জা অসহায় দৃষ্টিতে বাইরে তাকালো। 'ফল' (FALL)–এর শুরু। গাছের পাতারা রঙ বদলাতে শুরু করেছে। ম্যাপল আর ওক গাছের ধূসর লাল রঙের বাহার নজর কাড়ার মতো। দূরে সারি সারি পাহাড়ের অবয়ব নজরে পড়ে। ফায়জার কাছে এই স্থান সম্পূর্ণ অপরিচিত। তার বুকটা ধড়ফড় করছে। কি পরিকল্পনা এঁটেছে এন্ডি? সে ঝট্ করে দরজাটার উপরে নজর বোলায়। চলন্ত গাড়ী থেকে লাফ দেবার সাহস কি তার আছে? এন্ডি ব্যাপারটা লক্ষ্য করলো।

–ফায়জা, সুস্থির হয়ে বসো। কোন বোকামী করো না। চিন্তার কিছু নেই।

–কেন আমাকে এখানে এনেছো তুমি?

–দেখো, জায়গাটা তোমাব খুব ভালো লাগবে।

স্পষ্টতই ফায়জার কৌতূহল ঝট্ করে মেটানোর কোন আগ্রহ তার নেই। রাস্তার উপরে কাঞ্চামাগাস হাইওয়ে–এর সাইন দেখা গেলো। এন্ডি সেই রাস্তায় উঠলো। পাহাড়ি পথ বেয়ে এগিয়ে চললো গাড়ী। খুব ধীরে ধীরে অন্ধকারের বিশাল থাবা এসে গ্রাস করে নিচ্ছে পৃথিবীকে। সূর্যের শেষ রশ্মি মিলিয়ে গেছে বেশ আগেই। পরিবেশটা অসম্ভব বিষন্ন লাগে ফায়জার কাছে। তার রীতিমতো কান্না আসছে। এন্ডি যে এমন কিছু করার চেষ্টা করবে এটা আগেই বোঝা উচিৎ ছিলো। কি করে এতো বোকামি করতে পারলো সে? তবে মন্দের ভালো এই যে, সে জানে এন্ডি তাকে ভয়ানক পছন্দ করে –কিংবা হয়তো ভালোই বাসে। তার কোন ক্ষতি সে করতে চাইবে না। সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লো। হ্যাঁ, মন্দের ভালোই!

কাঞ্চামাগাস হাইওয়ে ছেড়ে একটা চিকণ মাটির রাস্তায় উঠলো এন্ডি। পাহাড়ি পথ, বেশ চড়াই। চারিদিকে ঘন গাছ–পালার বসতি। মাইলখানেক ড্রাইভ করে রাস্তা ছেড়ে জংলি পথে গাড়ী নামালো এন্ডি। সিকি মাইলটাক গিয়ে ঘন হয়ে জন্মানো ঝোপের পেছনে গাড়ীটিকে থামালো ভুল করেছি ভালোবেসে কখানা বিস্তৃত চাদরের মতো রাত এসেছে, ঢেকে গেছে সূর্যের শেষ রশ্মিটুকু। এন্ড নঃশব্দে গাড়ী থেকে নীচে নামলো। ফায়জা দিশেহারার মতো চারিদিকে তাকালো। এই বন্য পরিবেশ এবং অজানা ভবিষ্যৎ মুহূর্তের জন্য তাকে আড়ষ্ট করে দিলো। তার ইচ্ছে হলো চিৎকার করে কাঁদতে। কোথায় নিয়ে চলেছে এন্ডি? ওর ইচ্ছার বির দ্ধে ওকে এই বিরান জায়গায় নিয়ে আসার কি অধিকার আছে তার?

এন্ডি শান্ত কণ্ঠে বললো–চলো ফায়জা। আমাদেরকে আরো মাইলখানেক হাঁটতে হবে। পাহাড়ি পথে কখনো হেঁটেছো? ফায়জা নিজেকে স্বাভাবিক রাখবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে অর্থহীন চিৎকার, কান্নাকাটি করে কোন লাভ নেই। তাতে এন্ডি উত্তেজিত হয়ে অনাকাংখিত কিছু করে ফেলতে পারে। সে ধীর পায়ে গাড়ী থেকে বেরিয়ে এলো। এন্ডির প্রশ্নের উত্তরে মাথা নাড়লো। –নাহ! আমার এতো পাহাড়–পর্বত প্রীতি নেই।

–মিথ্যে বলছো। কবিদের প্রিয় বস্তু হচ্ছে প্রকৃতি।

–আমি কবি নই। মাঝে মাঝে দুই এক লাইন লিখলেই সে কবি হয়ে যায় না।

–এখন তর্কের সময় না। কিন্তু এইটুকু বলতে পারি, এই জায়গাটা তোমার কাছে ভীষণ ভালো লাগবে। পাহাড়, বনানী, ঝর্না সব মিলিয়ে স্বর্গীয় পরিবেশ। আমি তো মাঝে মাঝেই এখানে চলে আসি।

–কি নাম জায়গাটার?

–এই পুরো এলাকাটিকে বলে হোয়াইট মাউনটেন্‌স্‌। যেখানে নিয়ে যাচ্ছি সেখানে একবার গেলে আর ফিরতে চাইবে না।

–ফিরতে চাইলেও যে ফেরা যাবে তাতো মনে হয় না। হাজার হোক কিডন্যাপড হয়েছি।

এন্ডি ফায়জার বক্রোক্তি এড়িয়ে গিয়ে বললো–চলো, রওনা দেয়া যাক। বেশী রাত হবার আগে পৌঁছানই ভালো। এখানে মাঝে মাঝে টাইগার চলাফেরা করে।

ফায়জা এবার একটু ভড়কে গেলো। একদিনের জন্য অনেক আপদের মুখোমুখি হওয়া গেছে। এখন আর কোন বণ্য প্রাণীর সাথে মোলাকাত করার কোন ইচ্ছা নেই তার। সে বললো –এই রাতে আর না গেলাম।

এন্ডি গাড়ীর ট্রাংক খুলে হাইকিং সুজ, টর্চলাইট, পানির বোতল এবং কম্পাস বের করলো। একজোড়া জুতো ফায়জার সামনে রাখলো সে। ফায়জার কথার প্রত্যুত্তর না দিয়ে দ্রু তহাতে জুতা পরলো। –জুতাটা পরে নাও। এটা ছাড়া এতো ঢালু পথ বেয়ে উঠতে পারবে না। টর্চলাইটটা হাত ৪১ া। পানির বোতলটিও সাথে রাখবে। আর ট্রেইলে উঠে আমার ঠিক পেছনে থাকবে। ফায়জা উদ্বিগ্ন মুখে বললো–এই ভুতুড়ে জঙ্গলের মধ্যে যেতেই হবে?

এন্ডি নিরু ত্তরে টর্চলাইট জ্বেলে ট্রেইল ধরে হাঁটতে লাগলো। ফায়জা এবার সত্যিই ভয় পেলো। এই জনশূণ্য বনের মাঝখানে তাকে একাকি থাকতে হলে সে হার্টফেল করেই মারা যাবে। দ্রু ত হাতে হাইকিং সুজ পরে নিয়ে টর্চলাইট এবং পানির বোতল দুহাতে ধরে এন্ডির পেছন পেছন দৌড়ালো সে। এন্ডি আস্তে ই হাঁটছিলো। তাকে ধরতে বিশেষ অসুবিধা হলো না।

যতখানি ভীতিকর এবং অদ্ভুৎ মনে হবে ভেবেছিলো তার সিকিভাগও লাগলো না ফায়জার। বরং প্রাথমিক ভীতিবোধটুকু কেটে যাবার পর গভীর রাতে পাহাড়ি এবং জংলি আঁকা বাঁকা পথ ধরে হাঁটতে তার ভালোই লাগতে শুরু করলো। সম্পূর্ণ ব্যাপারটার ভেতরে যে বেশ খানিকটা রোমাঞ্চ আছে সেটা অস্বীকার করা সম্ভব হলো না। সে সারাজীবন শহরেই মানুষ। বন–জঙ্গলে দু'একবার যে যায়নি তা নয় কিন্তু সে যাওয়া নিতান্ত ই বনভোজন জাতীয় ব্যাপার। সত্যিকারের বন্য অভিজ্ঞতা তার কখনো হয়নি। টর্চের আলোয় পথ দেখে আঁকা বাঁকা, উচু–নীচু পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে নিজের অজান্তে ই সে বনের ভাষা শুনতে শুরু করলো। পাতার শির শির শব্দ, ঝি–ঝির ডাক, ছোট ছোট প্রাণীদের আচমকা দৌড়, গাছে পাখীদের আচমকা পাখার ঝাপটা, ফায়জা মনে মনে দু'এক লাইন কবিতাও লিখে ফেললো। এন্ডি ঠিক সামনেই আছে। একটু পর পরই পিছু ফিরে দেখে নিচ্ছে ফায়জাকে, পিছিয়ে পড়লে থেমে ধরার সুযোগ দিচ্ছে। কথাবার্তা বিশেষ একটা হচ্ছে না। না হলেই ভালো। এমনিতেই উপরের দিকে উঠতে হচ্ছে বলে সমস্ত শরীরের উপরেই বেশ চাপ পড়ছে, রীতিমতো দম লেগে যাচ্ছে ফায়জার। আলাপ চালাতে হলে কতক্ষণ হাঁটতে পারবে সন্দেহ আছে ওর। ইতিমধ্যেই বার দুয়েক থেমে বিশ্রাম নিয়েছে ও। এন্ডিও থেমেছে ওর সাথে। কিছু বলেনি। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছে। ইচ্ছা থাকলেও বেশীক্ষণ বিরতি নিতে পারেনি ফায়জা। কষ্ট হলেও তাড়াতাড়ি পৌঁছানোই ভালো –কোথায় পৌঁছাবে সেটা অবশ্য তার জানা নেই। চারিদিকে দেয়াল আর উপরে ছাদ থাকলেই চলবে। একটু না শুলে তার চলবে না। হাইকিং যে এতো ক্লান্তি কর হতে পারে ধারণাই ছিলো না তার।

চলতে চলতে ক্লান্তি র প্রায় শেষ সীমায় পৌঁছে গেলো ফায়জা, বন্য সঙ্গীতের মুর্ছনাও তাকে উজ্জীবিত করতে পারছে না আর। তার পা–দু'খানা দুইমনি দু'খানা পাথরের মতো মনে হচ্ছে।

কোনরকম টেনে টেনে সামনে এগিয়ে চলছে সে। শেষ পর্যন্ত লজ্জার মাথা খেয়ে জিজ্ঞেস করেই বসলো –আর কতদূর? আমি মনে হয় খুব বেশীক্ষণ হাঁটতে পারবো না।

–এই তো আর একটুখানি।

গত আধাঘন্টা ধরেই তাই বলছে এণ্ডি। এটা যেন একটা খেলা পেয়েছে। একটুখানি একটুখানি করতে করতে মাইলখানেক পেরিয়ে এসেছে মনে হচ্ছে। সে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো–অনেকক্ষণ ধরেই তো তাই বলছো। এতোদূরের পথ এই রাতে না গেলে কি হতো? নিজেই বলছিলে হিংস্র প্রাণী আছে। এভাবে হাঁটাটা কি নিরাপদ?

–দুঃশ্চিন্তা করো না। আমার কাছে পিস্তল আছে।

–কি? তোমার সাথে আগ্নেয়াস্ত্র আছে? এবার তুমি আমাকে সত্যি সত্যিই ভয় ধরিয়ে দিলে।

–কেন? হিংস্র প্রাণীদের হাত থেকে বাঁচতে হলে অস্ত্র তো একটা থাকা দরকার, ঠিক কিনা?

–অবশ্যই। তবে তোমার যেমন কাজকর্মের ছিরি দেখছি তাতে আমার দুঃশ্চিন্তা হচ্ছে এখন।

এন্ডি এই খোঁচাটাও নির্বিকার হজম করে ফেললো। সে নিঃশব্দে হেঁটে ঘন গাছপালার বন পেরিয়ে একটা খোলা জায়গায় বেরিয়ে এলো। অনতিদূরেই একটা কাঠের কেবিন ঝট্ করেই চোখে পড়লো। ছোট্ট কিন্তু সুন্দর। ফায়জা মুগ্ধ হয়ে গেলো।

–কি সুন্দর! এখানে কেবিন বানালো কে?

–আমার বাবা–মা।

–তারা কি এখন এখানে?

–না না। তাদেরকে নিয়ে দুঃশ্চিন্তা করো না।

–দুঃশ্চিন্তা করছিলাম নাতো। তোমার জন্যে চিন্তা হচ্ছিলো। অধিকাংশ বাবা–মাই নারী ছিনতাইয়ের ব্যাপারটা পছন্দ করেন না।

–ছিনতাই? তুমি নিজ ইচ্ছায় আমার সাথে হেঁটে এসেছো। আমি তো তোমাকে জোর করিনি।

–ওমা, তাই তো! কি করে ভুলে গেলাম সেটা? কিন্তু এই ভুতের মুলুকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে আনলোটা কে আমাকে?

এন্ডি সেই প্রশ্ন এড়িয়ে পকেট থেকে একটা চাবি বের করে কেবিনের সদর দরজায় ঝোলানো বড়–সড় তালাটা খুলে ফেললো। টর্চলাইট দিয়ে বাইরে এবং ভেতরে দ্রুত চোখ বোলালো ও। মন্দ কিছুই চোখে পড়লো না। সে কেবিনের ভেতরে ঢুকে দ্রুত হাতে কেরোসিনের বাতি জ্বাললো। ফায়জাও তার পিছু পিছু ভেতরে ঢুকলো। এন্ডি বললো –এখানে ইলেকট্রিসিটি নেই। কিন্তু এই পরিবেশে লণ্ঠনই মানায়।

ফায়জা মনে মনে স্বীকার করলো। ছোট বেলায় গ্রামে গেলে তার যেমন চমৎকার একটি অনুভূতি হতো ঠিক সেইরকম অনুভূতি হলো এখন। কেমন যেন একটা ছেলেমানুষি ফূর্তি। সে বাঁকা গলায় বললো–আমার কিন্তু ভয়-ভয়ই লাগছে। ভূত–পেত্নী নেইতো এখানে?

–ভূত বলতে এই শর্মাই আছে। ভয় নেই ঘাড় মটকাবে না। চলো তোমার ঘরটা দেখিয়ে দেই।

–পিজ। আমার একটু চিৎ হওয়া দরকার। শরীরের প্রত্যেকটা হাডডির মধ্যে হাতুড়ি পড়ছে। একটু বিশ্রাম না নিলে দম বন্ধ হয়ে যাবে।

এন্ডি একটা লণ্ঠন উঁচু করে ধরলো। সেই আলোতে কেবিনের ভেতরটা খানিকটা আলোকিত হয়ে উঠলো। ছোট্ট লিভিংরুম, লাগোয়া রান্নাঘর। আসবাবপত্রের মধ্যে একটা হাতে বানানো রকিং চেয়ার। এন্ডির পিছু পিছু একটা চিকন, সংক্ষিপ্ত করিডোরে বেরিয়ে এলো ফায়জা। মুখোমুখি দুটি কামরা। এন্ডি ডানদিকের কামরাটিতে ঢুকলো, পেছনে ফায়জা। কামরাটা ছোট্ট, কোন রকমে একটি কাঠের খাট বসানো গেছে। খাটে নতুন বেড শীট এবং বালিশ!

এন্ডি বললো–তোমার ঘর।

–আমার একার, ঠিক তো?

–ধর্ষণে আমার বিশেষ অভিজ্ঞতা নেই।

–ভালো। তোমার আয়ু একটু বাড়লো।

–সৌভাগ্য আমার!

–তুমি বোধহয় ঐ পাশের কামরাটিতে থাকবে।

–তুমি চাইলে এখানেও থাকতে পারি।

ফায়জা এন্ডির ঠাট্টার উত্তরে ছদ্মকোপে ভ্র কুচকালো। –জ্বি না। আমারটা আমার, তোমারটা তো… এনেছিলে এখানে?

–না… বলেছিলাম। ওরা আসেনি। যাক, তোমার বিশ্রাম দরকার। আধঘন্টার মধ্যে খাবার রেডি হয়ে যাবে। নিশ্চয় অনেক ক্ষুধা লেগেছে তোমার?

–ভীষণ। কি রান্না করছো তুমি?

–দেখি, অবাক করাতে পারি কিনা।

–দেখো, তুমি আবার সারাক্ষণ অবাক করাবার চেষ্টা করো না। আরেকজনের পালায় পড়ে ইতিমধ্যেই জীবনে অনেক আচমকা ধাক্কা খেতে হয়েছে। থাক ওসব। আমার পোশাক পাল্টানো দরকার ছিলো। কিন্তু জিনিষপত্রতো সব গাড়ীতে!

–আমি তোমার জন্য জামা–কাপড় কিনেছিলাম। ক্লোজেটে আছে। আশাকরি ওগুলো তোমার গায়ে ঠিকঠাক লাগবে।

ফায়জা একটু অবাকই হলো। –তোমার মেয়েদের পোশাক কেনার অভ্যাস আছে জানতাম না। পানি আছে এখানে? একটু হাত মুখ ধুতে পারলে ভালো লাগতো। খুব ময়লা–ময়লা লাগছে।

এন্ডি বাইরের দিকে নির্দেশ করে বললো–করিডোরের শেষ মাথায় বাথরূম। বালতিতে পানি রাখা আছে। পাশের লেক থেকে পানি বয়ে নিয়ে আসতে হয়। সুতরাং, একটু বুঝে সুঝে খরচ করো নইলে এই শর্মাকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পানি বইতে হবে। লন্ঠনটা এখানে রেখে যাচ্ছি।

ফায়জা একটু উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললো–তুমিতো রান্নাঘরেই থাকবে, তাই না?

এন্ডি আলতো হাসলো। –ভয় পাবার কোন কারণ নেই। আমি মাত্র বিশ ফুট দূরেই থাকবো। কথা দিচ্ছি, এখানে কোন ভূতের উপদ্রবও নেই। অন্ততপক্ষে আমার জানামতে নেই।

–আরে না, আমি তো ভয় পাচ্ছি না। এমনি ঠাট্টা করছি।

এন্ডি লন্ঠনটা মেঝেতে নামিয়ে রেখে চলে গেলো। তার পদক্ষেপের শব্দ লিভিংরূমের দিকে চলে গেলো। ফায়জা ছোট্ট কামরাটির চারিদিকে চোখ বোলায়। খাট এবং কাঠের ক্লোজেট ছাড়া আর কোন আসবাবপত্র নেই। রাখার স্থানও হতো না। সে ক্লোজেট খুলে একটু অবাকই হলো। এক ডজন পোশাক হ্যাংগারে ঝোলানো। একেকটা একেক রকমের। কিন্তু প্রত্যেকটাই শালীন, র চিকর, যথেষ্ট মূল্যবান। তাকে স্বীকার করতেই হলো এন্ডির র চি আছে। সে একটা গাউন বেছে নিলো। দ্রুতহাতে পোশাক পাল্টিয়ে বাথরূমে গেলো। দুইটা বড় বড় কাঠের বালতি… । একটা ছোট্ট পাষ্টিকের মগ। একজোড়া নতুন তোয়ালে। দ্বিধাদ্বন্দ্ব করতে করতে … পানি খরচ করে গোসলটা সেরেই ফেললো ফায়জা। এন্ডি মন খারাপ করলে করূক। প্রতিদিন গোসল না করলে ফায়জার জঘন্য লাগে। তারপর আজ আবার এতোখানি পথ ধুলাবালি, গাছপালা ঠেলে হেঁটে আসতে হয়েছে। কিডন্যাপ যখন করেছো, এখন পানি টানো।

ভেজা চুলে তোয়ালে বেঁধে বাইরে পা রাখতেই লিভিংরূম থেকে এন্ডির ডাক এলো –খাবার তৈরি। ক্ষুধা লাগলে চলে এসো।

ফায়জা চিন্তা করেনি এন্ডি এতো দ্রুত খাবারের ব্যবস্থা করে ফেলবে। তার নাড়িভুঁড়ি ক্ষুধায় চিন চিন করছে। সে সরাসরি লিভিংরুমে চলে এলো। কিচেন এবং লিভিংরুম সঙ্গমে ছোট্ট এক টুকরো ফাঁকা জায়গায় আঁটোসাঁটো করে একটি কাঠের টেবিল বসানো। দুটি কাঠের হাতে বানানো চেয়ার। গাছের ডালপালা এবং দড়ি দিয়ে তৈরি করা। টেবিলের উপরে বেশ কয়েকপদের খাবার। লণ্ঠনের আলোয় ভালো দেখা না গেলেও গন্ধে মৌ মৌ করছে। ফায়জা কোন দ্বিধা না করে একটা চেয়ার দখল করলো। –বাব্‌বাহ্। তুমি তো অনেক কাজের!

এন্ডি লাজুক গলায় বললো–সবগুলোই টিনের খাবার। গতকাল আমি কিছু শসা এবং টমেটো এনেছিলাম। সালাদটা ফ্রেস। শুরু করো।

–তুমি গতকালও এখানে এসেছিলে?

–হ্যাঁ, কিছু জিনিষপত্র আনা দরকার ছিলো। তাছাড়া কেবিনটা ময়লাও হয়েছিলো।

–এটা তুমি অনেক প্যান করেই করেছো, তাই না?

এন্ডি ফায়জার প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে বললো–বিনটা ট্রাই করো আগে। আমার খুব পছন্দ এটা।

–হ্যাঁ, দেখে তো খুব ভালো লাগছে। দেখি একটু চেখে।

ফায়জা এক চামচ বিন নিজের পেটে ঢাললো। সামান্য একটু মুখে নিয়ে খেলো। এন্ডি বললো –ভালো? মন্দ? বিস্বাদ?

–দারুণ! তুমি এতো ভালো রান্না করতে পারো জানা ছিলো না।

–রান্না আর কি! টিনের খাবারের সাথে এটা সেটা মিশিয়ে ফুটিয়ে নেয়া। প্যাসতাটা খে

ভুল করেছি ভালোবেসে

–সবগুলোহ খাবো। পেট চোঁ চোঁ করছে।

খেতে খেতে চারিদিকে ভালো করে চোখ বোলালো ফায়জা। আধো অন্ধকারে দেয়ালে ঝোলানো বেশ কিছু ছবির দিকে ওর দৃষ্টি আকর্ষিত হলো। এক তরুণ দম্পতির ছবি, আনন্দোজ্জ্বল! ফায়জা বললো–তোমার বাবা মায়ের ছবি?

এন্ডি মাথা নাড়লো। –হ্যাঁ। তখন অবশ্য ওনারা খুব তরুণ ছিলেন।

–তারা কোথায় থাকেন এখন?

–এই বন–জঙ্গলের মধ্যেই কোথাও থাকেন। তারা হচ্ছেন শিল্পী। প্রকৃতি পাগল দু'জনাই।

–কি রোমান্টিক!

–তুমি কি ঐরকম হতে চাও?

–মনে হয় না আমি থাকতে পারবো। শহুরে জীবনের আরামে অতিরিক্ত অভ্যস্ত হয়ে গেছি আমি।

–একবার বন্য পরিবেশে মন বসে গেলে আর কোথাও যেতে চাইবে না।

ফায়জা মনে মনে একটু শংকিত বোধ করলো। এন্ডির এখানে কতদিন থাকার পরিকল্পনা? বন্য পরিবেশে অভ্যস্ত হবার প্রশ্ন কেন উঠছে?

খাওয়া শেষ হবার পর কথাবার্তা বিশেষ হলো না। ফায়জা আগেই ক্লান্ত ছিলো, এখন পেটে খাদ্য পড়তে তার শরীর একেবারে এলিয়ে পড়লো। সে এন্ডির কাছে মাফ চেয়ে তার ঘরে চলে এলো। দরজাটা ভালমতো বন্ধ করে লণ্ঠনটাকে খুব শীর্ণ করে জ্বালিয়ে রেখে বিছানায় চলে গেলো সে। মাথায় অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দুঃশ্চিন্তা ঢুকবার আগেই সে ঘুমে তলিয়ে গেলো।

নয়

হঠাৎ করেই ঘুম ভাঙলো ফায়জার। বিছানায় সটান হয়ে শুয়ে থেকে এই অদ্ভুৎ পরিবেশে নিজেকে আবিষ্কার করে এক মুহূর্তের জন্য একটু আতংকই অনুভব করলো সে। কিন্তু পরক্ষণেই তার স্মৃতি তাকে সব স্মরণ করিয়ে দিলো। লণ্ঠনটা এখনো জ্বলছে। কিন্তু সেই সামান্য আলোতে চোখ প্রায় চলেই না। বাইরে স্বাভাবিক বন্য শব্দ ছাড়া অস্বাভাবিক কিছুই শোনা যাচ্ছে না। কান পেতে এন্ডির চলাফেরার শব্দ শোনার চেষ্টা করলো ফায়জা। কোন শব্দ নেই। এন্ডি নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছে। কটা বাজে এখন? হাত বাড়িয়ে ঘড়িটা বালিশের পাশ থেকে হাতে তুলে নিলো ও। রাত তিনটা। আচমকা মাথার মধ্যে চিন্তাটা ঢুকলো। এন্ডি নিশ্চয় গভীর ঘুমে অচেতন এখন। সে যদি এই সুযোগে পালিয়ে যায়? ট্রেইল ধরে গাড়ী পর্যন্ত ফিরতে পারলে আর অসুবিধা হবার কথা নয়। পথ চিনে কাঞ্চামাগাস হাইওয়ে পর্যন্ত সে যেতে পারবে। ঐ রাস্তায় অনেক গাড়ি চলে নিশ্চয়। কেউ না কেউ তাকে দেখবেই। চিন্তাটা মাথায় ঢুকতেই তার বুক ধড়ফড় করতে শুরু করলো। বেশ কয়েকটা মুহূর্ত গেলো দ্বিধা–দ্বন্দ্বে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওরই জয় হলো। এন্ডির মনে কি আছে কে জানে। এখন পর্যন্ত তার পরিকল্পনা সম্বন্ধে সে কিছুই বলেনি। অপেক্ষা করার কোন অর্থ হয়না। ফায়জা খুব ধীরে ধীরে বিছানা ছাড়লো। দ্রুতহাতে গতরাতের পোশাক পরলো, হাইকিং জুতাজোড়া পায়ে লাগালো, টর্চলাইট এবং পানির বোতলটা নিয়ে প্রায় নিঃশব্দে দরজা খুলে অন্ধকার করিডোরে বেরিয়ে এলো। এন্ডির ঘরের দরজা বন্ধ। ফায়জা খুব সাবধানে লিভিংরুমে চলে এলো। বার কতক টর্চটা জ্বেলে সদর দরজার অবস্থানটা দেখে নিলো। বেশ সময় নিয়ে ধীরে ধীরে খুললো দরজাটি। সামান্য একটু শব্দ হলো দরজার পালাটা খোলার সময় কিন্তু ঘুমন্ত মানুষকে টেনে তোলার মতো নিশ্চয় নয়। বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এসে দরজাটা ভিড়িয়ে দিলো ও। অন্ধকার রাত। চারিদিকে অসংখ্য পোকা মাকড়ের ডাক। স্থবির গাছপালার রহস্যময় অবয়ব যেন পিষে ধরে আছে কেবিনটাকে। চারিদিকে ভীত সতর্ক দৃষ্টি বোলাতে বোলাতে ট্রেইল ধরে এগুতে লাগলো ফায়জা। তার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে, বুকের মধ্যে হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে। এই অসম্ভব নির্জন বনের মধ্যে সম্পূর্ণ একাকি পথ চলছে সে–ভাবতেই তার শরীরটা ভয়ে শিরশির করে উঠছে। কোথাও একটি পাতা পড়ার শব্দ হলেও লাফিয়ে উঠছে সে, ঝট্ করে টর্চের আলো ফেলছে সেদিকে, কিছু নেই দেখে আবার সাবধানী পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে। ভুতের ভয়ের কথা বাদ দিলেও হিংস্র প্রাণী যে আছে সেই কথা তো এন্ডি আগেই বলেছে। তার কাছে অস্ত্র বলতে কিছুই নেই। তেমন কোন প্রাণীর মুখোমুখি হলে কিছুই করার থাকবে না তার। হঠাৎ শুকনা ডালে পা পড়লো ওর, মচাং করে ভেঙ্গে গেলো সেটা। রাতের আপেক্ষিক নিস্তব্ধতায় সেই শব্দ কামান দাগার মতো শোনালো, হঠাৎই যেন চারিদিকে একটা তোলপাড় উঠে গেলো। গাছের উপর থেকে বেশ কিছু পাখি সমবেতভাবে পাখা মেলে প্রতিবাদ করলো, একটা প্যাঁচা ডেকে উঠলো ভীতিকর গলায়, শুকনা পাতায় শব্দ তুলে কি যেন একটা দৌঁড়ে গেলো। কিছু ভাবার অবসর পেলো না ফায়জা। তার ভীতিবোধেরই জয় হলো। উল্টা ঘুরে পড়িমড়ি করে কেবিন লক্ষ্য করে দৌড় দিলো

ভুল করেছি ভালোবেসে

এবং পানির বোতল কোথায় ছিটকিয়ে পড়লো। দ্রুত কয়েকবার ... গেল না। কিন্তু অপেক্ষা করলো না ও। কেবিন ছেড়ে সামান্য পথই এসেছিলো সে। অন্ধকারে তার দৃষ্টিও খানিকটা সয়ে এসেছে। সে কোনরকমে হাতড়িয়ে হাতড়িয়ে, ঘাই–গুতা খেতে খেতে কেবিনে ফিরে এলো। ভেতরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে সেটাতে পিঠ ঠেকিয়ে একটু বিশ্রাম নিলো ও। দম ফিরে পেয়ে কান পাতলো। নাহ্, এন্ডি এখনও ঘুমাচ্ছে। ভালো হয়েছে। ফায়জা পালানোর চেষ্টা করেছে জানতে পারলে ক্ষেপে গিয়ে সে কি করবে কে জানে। ফায়জা পা টিপে টিপে নিজের কেবিনে চলে এলো। দরজাটা বন্ধ করে বিছানায় ফিরে গেলো সে। টর্চলাইটটা হারানো ঠিক হলো না। এন্ডি খেয়াল করলে কি বলবে? কিছু একটা বানিয়ে বলতে হবে। সে মনে মনে যুতসই একটা কিছু কারণ খুঁজবার চেষ্টা করতে থাকে।

এন্ডি কান খাড়া করে ফায়জার দরজা বন্ধ হবার শব্দ শুনলো। তার ঘুম খুবই পাতলা। ফায়জার সমগ্র অভিযানটাই সে টের পেয়েছে। কিভাবে শেষ হবে তা যেন ও জানতই। বিছানা ছেড়ে উঠবার কোন প্রয়োজনও অনুভব করেনি। তার ঠোঁটে এক চিলতে হাসি ফুটে উঠলো। পাশ ফিরে ঘুমানোর চেষ্টা করলো সে।

ফায়জার ঘুম ভাঙলো বেশ দেরীতে। গতরাতের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতাটুকুর পর আবার ঘুম আসতে বেশ খানিকটা সময় লেগেছিলো। পোশাকে ধুলাবালি, শুকনা পাতা লেগেছিলো। রাতে আর বদলায়নি, সোজা বিছানায় চলে গিয়েছিলো। সেটা বদলিয়ে একটা শার্ট–প্যান্ট পরলো ও। দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলো। এন্ডির ঘরের দরজা হাট করে খোলা, ভেতরে কেউ নেই। কোথা থেকে যেন খুব সুরেলা শীষের শব্দ আসছে। সেই শব্দ অনুসরণ করে পেছন দিকের আঙিনায় চলে এলো ফায়জা। যা দেখলো তাতে ওর বাস্তবিকই অবাক হবার পালা। প্রশস্ত আঙিনার একপাশে ছোট্ট একটা গ্রীনহাউজের মধ্যে গোলাপের বাগান। ফায়জা দরজা ঠেলে গ্রীনহাউজের ভেতরে ঢুকলো। এন্ডি গোলাপ গাছের পরিচর্যা করছিলো, ওকে দেখে সহজ গলায় বললো–শেষ পর্যন্ত ঘুম ভাঙলো তাহলে! রাতে ভুত–পেত্নী কিছু দেখেছিলে নাকি?

ফায়জা একটু চমকালো। ভুত–পেত্নীর কথা কেন উঠলো? কিছু টের পায়নিতো। প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলো ও। –তোমার বাগানটি তো খুব সুন্দর।

–তোমার পছন্দ হয়েছে?

–খুব! ... র প্রিয় ফুল।

–তাই নাকি? আমারও। দেখেছো আমাদের মধ্যে কেমন অসম্ভব মিল!

ফায়জা হাসলো। –দুনিয়ার অর্ধেক মানুষেরই প্রিয় ফুল গোলাপ।

–ওহ্, ভুলেই গিয়েছিলাম আমি এখনও এই দুনিয়ায় বাস করছি। তোমার মতো হুর পরী পাশে থাকলে ভুল হয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক।

ফায়জা স্তুতিবাক্য পছন্দ করে। বিশেষ এন্ডি যেভাবে বলে তাতে অপছন্দ করার উপায় থাকে না।

ও লাজুক মুখে হাসলো।

–খুব বানিয়ে বানিয়ে কথা বলতে শিখেছো তুমি।

–মনের কথা বলেছি, মিথ্যে তো কিছু বলিনি। যাই হোক, ভয়ানক ক্ষুধা লেগেছে আমার। চলো, নাস্তা করা যাক।

নাস্তার টেবিলে বসে আবার অবাক হবার পালা। চমৎকার প্যানকেক এবং ভাজা ডিম। বাগানে কাজ করতে যাবার আগেই বানিয়ে রেখে গেছে এন্ডি। এন্ডি রাঁধুনি ভালো। ফায়জার ভালোই লাগছে। এমন ষন্ডামার্কা পুরুষ মানুষ তাকে ধরে এনে রেঁধে বেড়ে খাওয়াচ্ছে অভিজ্ঞতাটা বিরল হলেও মন্দ লাগছে না।

এন্ডি খেতে খেতে বললো –মাছ ধরতে পছন্দ করো তুমি?

–মাছ ধরতে? ফায়জার মুখ দেখেই বোঝা গেলো এই জাতীয় ব্যাপারে তার কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই।

এন্ডি গম্ভীর মুখে বললো –লাঠির ডগায় সুতা বেঁধে মাছ ধরা, কখনো শোননি?

ফায়জা রাগ দেখালো। –বেশী ফাজলামি করবে না। মাছ কিভাবে ধরে এটা জানবো না কেন? কিন্তু আমাদের দেশে ভদ্র ঘরের মেয়েদের এই জাতীয় ব্যাপার–স্যাপারে জড়ানোটা অভদ্রোচিত। যে কারণে আমার কখনো যাওয়া হয়নি।

–ও আচ্ছা! সেটা জানতাম না। কিন্তু তোমার আগ্রহ আছে এসব ব্যাপারে?

–নিশ্চয়!

–শিকারেও নিশ্চয় কখনো যাওনি?

–নাহ্। আমার এক চাচা শিকারি। যখন ছোট ছিলাম খুব বায়না ধরতাম আমাকে সাথে নেবার জন্য। কিন্তু আমার বাবা–মা যেতে দিতো না। এখানে কি শিকার করো তুমি?

–টার্কি, হরিণ, হাঁস –বেআইনি নয় এমন সবকিছুই।

–আমরা কি আজকে মাছ ধরবো, শিকারও করবো?

–শিকার করবো কালকে। আজ হচ্ছে মাছ ধরার দিন। আমার একটা কাঠের নৌকা আছে। পুরানো কিন্তু কাজ করে। ওটাকে লেকে নামিয়ে পাঁচ–দশসেরি মাছ ধরতে হবে।

–নৌকায় যাবো? আমি কিন্তু সাঁতার জানি না।

–চিন্তা করো না। আমি থাকতে তোমার কোন ক্ষতি হতে দেবো না।

ফায়জা বক্রোক্তি করলো –আমার হিরো!

নাস্তা শেষ হতে আবার পেছনের আঙিনায় চলে এলো ওরা। গ্রীন হাউজের পেছন থেকে টেনে একটা কাঠের নৌকা বের করলো এন্ডি। বড়জোর সাত–আট ফিট লম্বা, চার ফুটের মতো চওড়া। বেশ গভীর। দেখে বিশেষ মজবুত মনে হলো না ফায়জার কাছে। তার সন্দেহটুকু সহজেই নজরে পড়লো এন্ডির। হাসলো সে। –ভয় পেওনা। দেখে ভঙ্গুর মনে হলেও নৌকাটা খুবই শক্ত। আমি সারা গ্রীষ্মে এটা নিয়ে লেকে চষে বেড়িয়েছি।

–এটা কি তুমি বানিয়েছো?

–নাহ্। আমার বাবা বানিয়েছিলেন। কাঠের কাজে তার বিশেষ দক্ষতা ছিলো। চলো রওনা দেয়া যাক। তুমি ফিশিং রডগুলো নাও, আমি বোটটাকে টানি। শ'খানেক গজ গেলে তবে লেক। বাবা–মায়ের ইচ্ছা ছিলো লেকের ঠিক পাশেই কেবিনটা বানানোর কিন্তু যুতসই জায়গা পাওয়া যায়নি। এখানে খানিকটা পরিষ্কার জায়গা ছিলো, ফলে এখানেই কেবিনটা বানিযে ফেলেন। জংলি পথ। সাবধানে হেঁটো।

এন্ডি নৌকাটাকে টানতে টানতে সরু বন্য পথে নিয়ে এলো। ফায়জা ফিশিং রড়গুলো নৌকার ভেতরে চালান করে দিয়ে পেছন থেকে ঠেলতে লাগলো। ইচ্ছে করেই একটু জোরে ধাক্কা দিচ্ছে সে, এন্ডিকে নাস্তানাবুদ করার ইচ্ছা। এন্ডি পেছন ফিরে টানছে, ফায়জার সাথে তাল রাখতে [illegible]তা দৌড়াতে হচ্ছে। বার দুয়েক হোঁচট খেলো ও। তাকে ব্যথায় কঁকিয়ে উঠতে [illegible]র যেন বিশেষ রকম আনন্দ হলো। খিল খিল করে হাসছে সে।

এন্ডি রাগ দেখালো –কি নিষ্ঠুর মেয়ে তুমি!

প্রত্যুত্তরে আরেকটা জোর ধাক্কা দিলো ফায়জা। এন্ডি লাফিয়ে সরতে গিয়ে গাছের গুড়িতে হুমড়ি খেয়ে পড়লো। আরেক পশলা হাসি।

পানিতে নৌকা নামিয়ে লাফিয়ে ভেতরে উঠলো এন্ডি। ফায়জা অনেক কাঁপাকাঁপি করে, পোশাকের অর্ধেকটা ভিজিয়ে, বার দুয়েক আর্ত চিৎকার দিয়ে নৌকার মাঝখানে জড়সড় হয়ে বসলো। তার অবস্থা দেখে উদার কণ্ঠে হাসতে লাগলো এন্ডি। –কেমন জব্দ এইবার! দেবো নৌকা উল্টে?

–খবরদার না। ভালো হবে না কিন্তু। মরে গেলে পেত্নী হয়ে এসে ঘাড় মটকাবো।

–ভালোই হবে। আমরা ভুত–পেত্নী হাত ধরে স্বর্গে চলে যাবো।

–একদম বাজে কথা বলবে না।

ফায়জার ভয় কাটতে অবশ্য বেশীক্ষণ লাগলো না। প্রথম মাছটা ধরা পড়বার পরে তার সাহস অনেক বেড়ে গেলো। নৌকাটাকে বেশ মজবুতই মনে হচ্ছে। লেকের পানিতে ঢেউ প্রায় নেই বললেই চলে। নৌকা খুব সহজভঙ্গিতে ভাসছে। ফায়জা নিজেও একটি ফিশিং রড বাগিয়ে

ধরে বসে আছে। ইতিমধ্যে তাকে খানিকটা ছবক দিয়েছে এন্ডি। সে কাছাকাছিই বসে আছে আরেকটি রড নিয়ে। বড়সড় মাছ বড়শি গিলে হঠাৎ ছুট দিলে রড নিয়ে চলে যেতে পারে, একটু সতর্ক না হলে মৎসশিকারির পানিতে পড়ে হাবুডুবু খাওয়াটাও খুব বিরল নয়। তার নিজেরই বেশ কয়েকবার সেই অভিজ্ঞতা হয়েছে। ফায়জার তেমন অভিজ্ঞতা হোক সেটা সে চায় না। বেচারির আনন্দটাই মাটি হবে।

ঘন্টাখানেকের মধ্যে বেশ কয়েকটা রক ব্যাস, স্যাম ফিশ আর ট্রাউট ধরে ফেললো ওরা। ফায়জার আনন্দের শেষ নেই। সে উচ্ছল গলায় বললো–তোমার চেয়ে আমি বেশী ধরেছি।

–নিশ্চয়। আমি ধরেছি ছয়টা, তুমি দুইটা। তুমিই জিতেছো।

–ইস্, ছয়টা ধরেছো না ছাই। আমার একটাই তোমার চারটার সমান। আমি তোমার চেয়ে ভালো মাছুয়া। বিশ্বাসই হচ্ছে না কেউ এই লেকটার কথা জানে না। কি সুন্দর জায়গাটা?

–লোকালয় থেকে অনেক দূরে জায়গাটা। কেউ এদিকে আসে না।

ভুল করেছি ভালোবেসে এসেছিলেন কিভাবে?

–মনে হয় হাইকিং করতে করতে এখানে চলে এসেছিলেন। জায়গাটা দেখে ভালো লেগে যায়, ফলে কাছেই কেবিন বানিয়ে কিছুদিনের জন্য থেকে যান। আমি ঠিক জানি না।

–খুব রোমান্টিক ছিলেন তারা। লেকটার নাম কি?

–কঠিন কিছু নয়, প্রেমের সরোবর – লাভার্স লেক (Lover's Lake)।

–জানতাম এমন কিছু একটা বলবে, তুমি বানিয়ে বলনিতো?

–না, না। আমার বাবা–মায়ের দেয়া নাম। বিশ্বাস করো। ক্ষিধা লেগেছে তোমার?

–ভীষণ।

–তীরে যাওয়া যাক তাহলে। আমি আগুন জ্বেলে কয়েকটা মাছ পুড়িয়ে ফেলবো। দেখো কেমন মজা লাগে।

–শুনেই রোমাঞ্চকর মনে হচ্ছে।

–একবার খেলে সেই স্বাদ কখনো ভুলবে না।

এন্ডি দাঁড় টেনে নৌকাটিকে নিকটবর্তী তীরে নিয়ে এলো। মাটিতে লাফিয়ে নেমে নৌকাটিকে টেনে পানি থেকে উপরে তুলে ফেললো সে। ফায়জাকে হাত ধরে নীচে নামতে সাহায্য করলো। পানির পাশেই সামান্য ফাঁকা জায়গা দেখে ঝটপট ছোট্ট করে আগুন জ্বাললো ও। মাছগুলোকে ধুয়ে ফেলে একটা ডালের সাথে গেঁধে নিলো। এবার আগুনের দুইপাশে দু'টা ছোট খুঁটি মত পুতে তাদের উপরে মাছগুলোকে বসিয়ে দিলো। ফায়জা কৌতুহলী দৃষ্টিমেলে দেখছিলো। এন্ডি তাকে লক্ষ্য করে বললো –এবার মাঝে মাঝে একটু ঘুরিয়ে দিলেই হবে।

ফায়জা বললো –তুমি দেখছি এইসব কাজে খুব দক্ষ। প্রায়ই করো নাকি?

–গ্রীষ্মে প্রায়ই আসি এখানে। তখন করা হয়। এই জাতীয় ব্যাপারে আমার খুব আগ্রহ।

–আমার কিন্তু কখনো সুযোগই হয়নি।

–সুযোগ কখন কিভাবে আসে কে বলতে পারে।

ফায়জা নিঃশব্দে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লো। কথাটা সত্যি। এই অনিশ্চয়তার মধ্যেও প্রতিটি মুহূর্ত সে উপভোগ করছে। মনে হচ্ছে ওরা দু'জন এখানে কয়েকদিনের জন্য বেড়াতে এসেছে। কিন্তু মনে যা ৫৩ টুকু তারা দু'জনাই জানে। এই মুহূর্তে সেই প্রসঙ্গ টেনে না তোলারই সিদ্ধান্ত নিলো সে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই মাছ খাবার উপযোগী হয়ে গেলো। বুভুক্ষের মতো খাবারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো ওরা দু'জন। মাছের মৌ মৌ গন্ধে ক্ষিধেটা যেন আরো জাঁকিয়ে বসেছে।

এন্ডি বললো–কেমন লাগছে খেতে?

–খুবই সুস্বাদু!

–আগেই বলেছিলাম। একটা অদ্ভুৎ সুন্দর জায়গা দেখতে চাও?

–নিশ্চয়। কোথায় জায়গাটা?

–কাছেই। আসো আমার সাথে।

খেতে খেতে ছুটলো এন্ডি। ফায়জাও পিছু নিলো। ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পায়ে চলা সরু একটা পথ ধরে ছুটছে ওরা। গাছের ডালপালা এসে খোঁচা দিচ্ছে শরীরে। কিন্তু নতুন কিছু দেখবার উত্তেজনায় সেটা গায়ে মাখছে না ফায়জা। একটু পরেই সে পানির গর্জন শুনতে পেলো। ঘন হয়ে জমে থাকা ঝোপঝাড়ের একটা জঙ্গল পার হতেই সম্পূর্ণ দৃশ্যটা ঝট্ করেই ভেসে উঠলো চোখের সামনে। ছোট্ট কিন্তু অসম্ভব সুন্দর একটি জলপ্রপাত! উঁচু পাহাড়ের শরীর বেয়ে ঝর্নার মতো নেমে আসা পানি প্রায় ফুট দশেক উঁচু থেকে ঝপাৎ করে লাফিয়ে পড়ছে নীচের সরোবরে। নীচে সবুজ পানি সূর্যের আলোয় ঝিকমিকিয়ে উঠছে। ফায়জা আনন্দে চিৎকার করে উঠলো –জলপ্রপাত!

–এটার নাম কি আন্দাজ কর তো।

–"লাভারস্ ফল" (Lover's Fall)?

–হলো না। এটার নাম হচ্ছে 'কুল হার্ট' (Cool Heart)।

–যুতসই নাম। হৃদয়ের সমস্ত উত্তাপ এই শীতল পানির ছোঁয়ায় উধাও হয়ে যায়। তোমার জন্য এই রকম একটা জায়গাই ভীষণ ভাবে দরকার।

–ঠিকই বলেছো তুমি। দেখি আমার হৃদয়টাকে ঠান্ডা করা যায় কিনা।

এন্টি ঝটপট জুতা খুলে ফেললো। শরীর থেকে গেঞ্জীটাকে খসিয়ে ফেলে ঝপাৎ করে ঝাঁপিয়ে পড়লো ছোট্ট পুকুরটার মধ্যে। দুই হাতে পানি তুলে ফায়জার গায়ে ছুঁড়ে মারলো। ফায়জা হাসতে হাসতে পিছিয়ে গেলো। –আমার গায়ে নয় তোমার মাথায় ঢালো।

ভুল করেছি ভালোবেসে

য় নাটকীয় ভঙ্গিতে পানি ঢাললো।

ফায়জা প্যানতে লাথ দিয়ে এন্ডির দিকে আরো খানিকটা পানি ছিটিয়ে দিলো। –বেশী করে দাও। পাগলা!

এই কথায় এন্ডি বিশেষ রকম আনন্দ পেলো। সে দুইহাতে পানির ঝাপ্টা দিয়ে ফায়জাকে অর্ধেক ভিজিয়ে দিলো। পিছিয়ে যেতে গিয়ে পিছনে সোজা পানিতে এসে পড়লো ফায়জা। ভিজে জবজবে হয়ে গেলো সে; কিন্তু ব্যাপারটা পুরোপুরি উপভোগ করলো। পানিটা উষ্ণ, ঝকমকে।

এন্ডি বললো –এখানে গোসল করতে আমার খুব ভালো লাগে। পানিটা এতো পরিষ্কার!

–আমি কোনদিন জলপ্রপাতের নীচে গোসল করিনি। ছোটবেলায় গ্রামে গেলে পুকুরে কয়েকবার গোসল করেছি। কিন্তু এর তুলনায় সেসব কিছুই নয়।

–এই জলপ্রপাত এখন থেকে তোমার। তুমি এখানে যতো ইচ্ছা গোসল করবে।

–তুমি এমন ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে থাকলে করা যাবে না।

–এমন অসম্ভব সৌন্দর্য থেকে আমাকে বঞ্চিত করাটা তোমার উচিৎ নয়।

ফায়জা কিল দেখালো। –পিঠে যখন এটা পড়বে তখন বুঝবে কি থেকে বঞ্চিত হচ্ছো।

এন্ডি পিঠ পাতলো –কিলই সই। দাও লাগিয়ে।

ফায়জা সত্যি সত্যিই একটা কিল বসিয়ে দিলো এন্ডির পিঠে। এন্ডি কিছু বলার আগেই ঝট্পট পানি থেকে উঠে পড়লো সে।

এন্ডি দু'হাত বাড়িয়ে বললো–এবার বুকে একটা কিল দাও, প্রিয়ে।

ফায়জা ঠোঁট বাঁকালো। –তোমার স্বপ্নে, শয়তান কোথাকার!

তার ভিজা জুতা জোড়া খুলে এন্ডির গায়ে ছুড়ে মারলো সে। এন্ডি সেগুলো লুফে নিলো। ফায়জা ফিরতি পথ ধরলো। এন্ডিও হাসতে হাসতে তার পিছু নিলো।

দশ

অমরকে তার ল্যাবেই পেলো ডিটেকটিভ কোডি জেনিংস এবং জোন ব্রাউন। দু'জনাই মধ্য বয়সী। কোডি শ্বেতাঙ্গ, প্রায় ছ'ফুটের মতো লম্বায়, দোহারা গড়ন। মুখে বেশ একটা ভালোমানুষি ভাব আছে। জোন একটু খাঁটোই, বড়জোর পাঁচ ফুট আট। সে কৃষ্ণাঙ্গ। তার গড়ন কুস্তিগীরদের মতো। চোখে মুখে সবসময় একটা সতর্ক ভাব। দু'জনার মধ্যে কথাবার্তা কোডিই বেশী বলে। অধিকাংশ সময় জোন পর্যবেক্ষকের ভূমিকা পালন করে। এই মুহূর্তেও কোডিই অমরকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। –ফায়জাকে নিয়ে এন্ডি কোথায় যেতে পারে? কোন ধারণা আছে তোমার?

অমর মাথা নাড়লো। –কোন ধারণা নেই। ও যে এইরকম একটা কাজ করতে পারে সেটাই আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

জোন ঠান্ডা গলায় বললো–পুলিশে ঢুকবার আগে আমারও মানুষের প্রতি বিশ্বাস ছিলো অগাধ।

কোডি পরবর্তি প্রশ্ন ছুড়লো–বাবা–মা? ভাইবোন?

অমর বললো–ওর বাবা–মায়ের সাথে ওর যোগাযোগ আছে বলে মনে হয় না। তাদের সম্বন্ধে কখনই খুব একটা আলাপ করে না। আর আমি যতদূর জানি ওর অন্য কোন ভাইবোন নেই।

নোটবুকে সমস্ত তথ্য টুকে নিলো কোডি। অমরের হাতে একটা কার্ড ধরিয়ে দিলো। –অন্য কোন তথ্য মনে পড়লে আমাকে জানিও।

–নিশ্চয়।

ডিটেকটিভ দু'জন ওকে বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে গেলো। অমর হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। এন্ডি তাকে এইরকম একটা নাজুক অবস্থায় ফেলে দেবে এটা তার চিন্তার অতীত ছিলো।

ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে, বেশ কয়েকজন ছাত্র–ছাত্রীকে জিজ্ঞেস করে শেষ পর্যন্ত তাদের সন্ধান পাওয়া গেলো। যে দু'জন তরুনীর সন্ধানে এই খোঁজাখোঁজি, তাদেরকে সৌভাগ্যবশত করিডোরেই পাওয়া গেল। অনীতা এবং জেসলিন দুই ডিটেকটিভকে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ঘাবড়ে গেলো। তাদেরকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে কোডিই মুখ খুললো –তোমরাই কি অনীতা ও জেসলিন? ওখানে একটি মেয়েকে জিজ্ঞেস করতে সে তোমাদেরকে দেখিয়ে দিলো।

ওরা দু'জনাই বড় বড় চোখ করে ঘাড় দোলালো। –হ্যাঁ। আমি অনীতা, ও জেসলিন।

ভুল করেছি ভালোবেসে

...লো তোমাদের দু'জনকে এক সাথে পাওয়া গেছে। তোমাদে... ...মরা। এন্ডি মিল্‌স সম্বন্ধে।

অনীতা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। –যাক, তাহলে শেষ পর্যন্ত পুলিশ কিছু একটা করছে। গতকাল থেকে পুলিশের কাছে শুধু হাত জোড় করতে বাকি রেখেছি।

কোডি বললো–আমাদেরকে কিছু নিয়ম–কানুন মেনে চলতে হয়। যাইহোক, আমরা বোঝার চেষ্টা করছি ফায়জাকে নিয়ে এন্ডি কোথায় যেতে পারে। কোন ধারণা আছে তোমাদের?

অনীতা বললো–এন্ডিই যে ওকে নিয়ে গেছে সেটা ধরে নিচ্ছো কেন তোমরা?

জোন মুখ খুললো–এন্ডির সাথে শেষ দেখা গেছে ওকে। সুতরাং এই মুহূর্তে সেই আমাদের প্রধান সাসপেক্ট। প্রথমে আমরা তাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি। তাকে খুঁজে পেলে বাস্তবিকই কি ঘটেছিলো জানা যাবে।

জেসলিন বললো–হোয়াইট মাউনটেইন্‌সে ওর একটা কেবিন আছে। জায়গাটা আমি ঠিক চিনি না কিন্তু ও গ্রীস্মে প্রায়ই সেখানে যেতো।

কোডি নোটবুক খুললো–জায়গাটার অবস্থান সম্বন্ধে কোন রকম তথ্য দিতে পারবে তুমি? এলাকাটি বিশাল, জানোইতো।

–এন্ডি আমাকে খুব বেশী বলেনি।

অনীতা চিন্তিত মুখে বললো–ওর একটা দুঃসম্পর্কের ভাই আছে। সে হয়তো কিছু জানতে পারে। অমর তাকে চেনে। কোথায় থাকে তাও বোধহয় জানে। অমরের সাথে আলাপ করেছো তোমরা?

–করেছি। ও তো এই ভাইটা সম্বন্ধে কিছু বললো না। মনে হচ্ছে ওর সাথে আরেক দফা আলাপ করতে হবে। ঠিক আছে। আমার কার্ড রাখো। কোন তথ্য পেলে সাথে সাথে জানাবে।

–ফায়জাকে নিয়ে খুবই চিন্তার মধ্যে আছি আমরা সবাই। অনীতাকে বাস্তবিকই উদ্বিগ্ন দেখায়। গতরাতে যে তার ঘুম ভালো হয়নি, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।

জোন বিদায় নেবার আগে বললো–কোন খবর পেলে জানাবে। তারা দু'জন দ্রুত বাইরে বেরিয়ে এলো। অমরকে এখনিই ধরা দরকার। আবার খানিকটা পথ হাঁটতে হবে। অমরের প্রতি তারা একটু বিরক্তই হলো।

অমরের ল্যাবে তাকে পাওয়া গেলো না। বেশ কয়েকজন ছাত্র–ছাত্রী কাজ করছিলো। তাদেরই একজনকে ধরলো কোডি। –অমরকে দেখেছো তুমি?

–একটু আগেই বেরিয়ে গেলো।

–কখন ফিরবে বলেছে?

–কিছুই বলেনি?

–সুযোগ বুঝে উধাও হয়ে গেছে। চলো জোন। হয়তো বেশী দূর যায়নি এখনো।

তারা প্রায় দৌড়ে বেরিয়ে এলো করিডোরে। দৌড়াতে দৌড়াতেই পার্কিং লটে চলে এলো। অমরকে দূর থেকেই তার গাড়ীর মধ্যে ঢুকতে দেখলো ওরা। কাছেই গাড়ী রেখেছিলো কোডি। ঝটপট গাড়ীতে উঠে পড়লো ওরা। দ্রুত চালিয়ে অমরের গাড়ীর সামনে গিয়ে রাস্তা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে গেলো। গাড়ী থেকে নীচে নেমে অমরের মুখোমুখি হলো কোডি। –কোথায় যাচ্ছো?

অমর থতমত খেয়ে বললো–এক বন্ধুর বাসায়।

–তোমার এই বন্ধুটা এন্ডির ভাই সম্পর্কের কেউ তো নয়?

অমরকে চুপ করে থাকতে দেখে এবার একটু কড়া গলায় যোগ করলো সে –এই তথ্য আমাদের কাছ থেকে লুকানোটা তোমার ঠিক হয়নি।

অমর হতাশ কণ্ঠে বললো–এন্ডি যদি সত্যিই ফায়জাকে নিয়ে গিয়ে থাকে ও কোন অবস্থাতেই তার কোন ক্ষতি করবে না। ও একটু অন্য ধরনের ছেলে। আমি চাইনা ও জেলে পঁচে মরুক।

–আমরাও চাই না। কিন্তু আগে ফায়জাকে খুঁজে বের করা দরকার। ওর কেবিনে কখনো গেছো তুমি?

–না। টম গেছিলো। টম ওর দুঃসম্পর্কের ভাই।

জোন বললো–টম কোথায় থাকে জানো তুমি?

অমর বললো–নেটিকে কোথাও থাকে। এপার্টমেন্টে ওর ঠিকানা লেখা আছে।

–ভালো। চলো, ঠিকানাটা উদ্ধার করে টমের সাথে একটু আলাপ করে আসা যাক।

অমরকে তারা নিজেদের গাড়ীতে তুলে নিলো।

নেটিকে বেশ খানিকক্ষণ এদিক সেদিক চক্কর মারতে হলো তাদেরকে। অমরের কাছে যে ঠিকানা ছিলো সেটা ঠিক নয়। সেই রাস্তায় ২১০০ বলে কোন বাড়ীর নাম্বার নেই। অনেক চিন্তাভাবনা করে শেষ পর্যন্ত তারা ২১০ এ হানা দেবারই সিদ্ধান্ত নেয়।

বাসাটি ছোট্ট, পুরানো। সামনের আঙিনাটা প্রশস্ত।

অমরকে সাথী করে ডিটেকটিভ দু'জন সদর দরজার নক করলো। একটি যুবক দরজা খুললো। অমরকে দু'জন সন্দেহভাজন লোকের সাথে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে বেশ ঘাবড়ে গেলো। অমর তাকে প্রশ্ন করার সুযোগ দিলো না। –টম, এ হচ্ছে ডিটেকটিভ কোডি, ও ডিটেকটিভ জোন। তোমাকে খুঁজবার কারণটা ওদেরকে ব্যাখ্যা করার সুযোগ দেবে।

স্বাভাবিকভাবেই কোডি মুখ খুললো। –আমরা এন্ডি মিলস্‌কে খুঁজছি। আমরা সন্দেহ করছি সে একটি মেয়েকে কিডন্যাপ করে হোয়াইট মাউন্টেইন্‌সে তার কেবিনে নিয়ে গেছে।

টম হা হয়ে গেলো। –তাই নাকি! এন্ডি? ওতো সেরকম ছেলে নয়।

–এটা একটি সম্ভাবনা মাত্র। তাকে আমরা প্রথমে খুঁজে বের করতে চাই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। শুনেছি তুমি কেবিনটা চেনো। আমাদেরকে সেখানে নিয়ে যেতে পারবে?

–ওর আসলে দুইটা কেবিন আছে ওখানে। আমি একটাতে গিয়েছিলাম আমার বাবার সাথে তিনি মারা যাবার অল্প কিছুদিন আগে। সেও প্রায় বছর ছয়েক হয়ে গেলো। অন্যটাতে কখনো যাই নি।

–পার্বত্য এলাকার কত গভীরে কেবিনগুলো?

–প্রথম কেবিনটা কাঞ্চামাগাস হাইওয়ে থেকে মাইল দুয়েকের হাঁটা পথ। কিন্তু খুঁজে বের করাটা কঠিন। ঘন জঙ্গল ওদিকটা। দ্বিতীয়টা প্রথম কেবিন থেকে আরো বিশ মাইল দূরে।

জোন মুখ খুললো এবার। –সে তোমার সাথে যোগাযোগ তো করেনি?

–ওর সাথে বেশ কয়েক মাস আমার কোন আলাপই হয়নি।

কোডি চিন্তিত মুখে বললো–আজ ইতিমধ্যেই বেশ বেলা হয়ে গেছে। কাল সকালে রওনা দেয়া যাক। ও আরেকটা কথা, এন্ডির বাবা–মা কোথায় থাকে জানো?

ঘাড় নাড়কউ জানে না তারা কোথায়। বছর দশেক আগে হঠাৎ করেই উধাও হয়ে যান দু'জন।

–তাই নাকি? ওর সাথে তোমার সম্পর্ক কি?

–আমরা ফুপাতো ভাই হই। আমার মা ওর বাবার একমাত্র বোন। এন্ডি আমাদের সাথে বহু বছর বসবাস করেছে। আমার মা তার দেখাশোনা করতো। ওর বাবা–মা ছিলেন ভবঘুরে ধরনের। মা মারা যাবার পর এন্ডিও বাসা ছেড়ে চলে যায়। সেও প্রায় ছয়–সাত বছর হয়ে গেলো।

–ঠিক আছে। রাতে বাসাতেই থেকো। আমি তোমাকে জানাবো কাল সকালে কোথায় আমাদের সাথে দেখা করতে হবে। তোমার ফোন নাম্বারটা কত?

টম নাম্বারটা দিলো। কোডি যত্ন সহকারে টুকে নিলো। অমরকে টমের সাথে আলাপ করবার কোন সুযোগ দিলো না তারা। একরকম টেনে গাড়ীতে নিয়ে তুললো। অমরের ভীষণ মন খারাপ হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত এন্ডি কি জেলের ঘানি টানবে? এমন একটা গর্দভের মতো কাজ সে কিভাবে করতে পারলো?

সন্ধ্যায় কেবিনে ফিরেই রাঁধতে লেগে গেছে ফায়জা। সেও যে পাকা রাঁধুনি এটা প্রমাণ না করা পর্যন্ত তার শান্তি হবে না। গ্যাসের চুলা জ্বালিয়ে কোমর বেঁধে হাড়ি–পাতিল, খুন্তি বের

করেছে সে। পাঁচসেরি একটা ব্যাস মাছ ধরেছে ওরা। সেটাকে যুতসই করে রান্না করবার ইচ্ছা। এন্ডি সন্দেহ ভরা দৃষ্টি নিয়ে তার তোড়জোড় পর্যবেক্ষণ করছে।

ফায়জা চোখ মটকালো। –ওভাবে তাকাচ্ছো কেন? আমার মা ভীষণ ভালো মাছ রাঁধে। আমাকে বেশ কয়েকবার দেখিয়েছেন কিভাবে রাঁধতে হয়। চিন্তার কোন কারণ নেই।

এন্ডি নিরীহ কণ্ঠে বললো –কখনো রাঁধোনি, শুধু দেখেছো?

–তো?

–ক্ষেপে যাচ্ছো কেন? তোমার যতো ইচ্ছা রাঁধো। শুধু আমার কেবিনটা পুড়িয়ে দিও না।

–বাজে কথা বলো না। আমি অতো কাঁচা কাজ করি না। যাও, এখন মাছটা ধুয়ে কেটে

ভুল করেছি ভালোবেসে

–নিশ্চয়। কঠিন কাজগুলো সব আমাকেই করতে হবে।

ফায়জা খিল খিল করে হাসতে লাগলো। মাছ কাটাকাটির মধ্যে সে নেই। চারিদিকে কাঁটা ভর্তি। কখন কোথায় বিঁধে যাবে। সে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে এন্ডিকে খুব খবরদারি করলো। এভাবে কেটো না। আড়াআড়ি কাটো। এতো বড় বড় টুকরো করছো কেন? কোনদিন মাছ কাটোনি? একটা কাজও কি ঠিকমতো করতে পারো না?

এন্ডি মন খারাপ করে বললো –তুমি বেশী খুঁতখুঁতে। এর চেয়ে পুড়িয়ে খাওয়াই ভালো।

–হ্যাঁ। জংলিদের মতো সারাক্ষণ পুড়িয়ে খেলে চলবে! ধমকে উঠলো ফায়জা। এন্ডি নীরবে সহ্য করলো।

মাছ ভাজতে গিয়ে আরেক ফ্যাসাদ। গরম তেলে পানিসহ মাছ ফেলতেই তেলে প্রচন্ড তড়বড়ানি শুরু হয়ে গেলো। গরম তেলের ছোটাছোটিতে রান্নাঘর ফেলে পালালো ফায়জা। এন্ডি লিভিংরুম মে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা উপভোগ করলো। তাকে মিটিমিটি হাসতে দেখে ফায়জা চোখ পাকালো। –তোমার প্যানটাই নষ্ট।

–হ্যাঁ, প্যানেরই তো দোষ। গরম তেলে পানি দেয়ার মধ্যে দোষের কিছু নেই।

–ইস্, নির্ঘাত ফোস্কা পড়বে হাতে।

–থাক, তোমার আর রাঁধতে হবে না। আমিই করছি।

–জ্বি না। তুমি টেবিল গোছাও। আমার মাছে হাত দেবে না।

শ্রাগ করলো এন্ডি। –জ্বি, মাদাম শেফ। কিন্তু এটাই আপনার শেষ রান্না। আমার সারা কেবিনে তেলের দাগ হয়ে গেছে।

ফায়জা রাগ করতে গিয়েও হেসে ফেললো। কথাটা মিথ্যে বলেনি এন্ডি। লিভিংরুম মের দেয়ালেও তেলের ফোঁটা স্পষ্টতই চোখে পড়ছে। তাকে অবশ্য এটা নিয়ে আদৌ লজ্জিত মনে হলো না। –ধরে যখন এনেছো, এবার বিপদ সামলাও!

রাতের খাওয়া শেষ করে ওরা দু'জন কেবিনের সামনের ছোট্ট বারান্দায় এসে কাঠের রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছে। আকাশে চাঁদ। বাতাসে সামান্য শৈত্যতা থাকলেও এখনো কাঁপুনি ধরার পর্যায়ে যায়নি। আকাশে কয়েক টুকরো সাদা মেঘ ঠায় দাঁড়িয়ে আছে রূপালি ছোপ নিয়ে। গাছের পাতায় পাতায় ঝিরঝির শব্দের সঙ্গীত। দূর থেকে ঝর্ণার পানির অনবরত কলকল ঝপাৎ শব্দ ভেসে আসছে।

ফায়জা সম্পূর্ণ পরিবেশটুকুই অবাস্তব মনে হয়। সে বললো–রাতের বেলা খুব অদ্ভুৎ লাগে এই জায়গাটা।

এন্ডি নরম কণ্ঠে বললো–বুনো নিঃশব্দতায় অভ্যস্ত হতে একটু সময় লাগে।

–বুনো নিঃশব্দতা! বেশ কাব্যি করে বললে তো।

–তোমার একটা কবিতা শোনাও না আমাকে।

–আমার এখন কবিতায় মন নেই। ফায়জা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লো। –ওরা নিশ্চয় এতক্ষণে আমাকে খুঁজতে শুরু করেছে। আমার বাবা মা এই খবর শুনলে পাগল হয়ে যাবেন।

এন্ডি বললো–আগামী শুক্রবারের আগে তোমার ঢাকা পৌঁছানোর কথা নয়। তাই না?

–হ্যাঁ, কিন্তু লন্ডন থেকে তাদেরকে ফোন করার কথা ছিলো আমার।

–ভুলে গেছো।

–অমর যদি জানিয়ে দেয়।

–অমর গাধা নয়। এতো তাড়াতাড়ি দেশে কিছু জানাবে না সে।

–এখানে কতদিন থাকবো আমরা?

–কেন, তোমার ভালো লাগছে না। আমি বোধহয় তোমাকে ঠিক মতন আদর যত্ন করছি না।

–সেটা বলিনি আমি। কিন্তু এখানে আমরা চিরদিন থাকতে পারবো না। আমাকে বাসায় ফিরতে হবে।

–ফিরবে। শীঘ্রিই।

–পুলিশ যদি আমাদেরকে খুঁজে পায়, তাহলে কি হবে?

–পালাবো আমরা। এখান থেকে অনেক দূরে চলে যাবো। এমন কোথাও যেখানে ওরা আমাদেরকে ধরতে পারবে না।

–আমি অনেক অনেক দূরে যেতে চাই না, এই পাহাড় পর্বতের মধ্যে তো নয়ই।

হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে ফেললো এন্ডি। –এই পাহাড়–পর্বত, জঙ্গল এবং জলপ্রপাত নিয়ে একটা গান লিখেছি আমি। কথা দিচ্ছি শুনে তোমার পেট গোলাবে না। আমার কণ্ঠ নিতান্ত মন্দ নয়।

ভুল করেছি ভালোবেসে

এান্ড ফায়জাকে অবাক করে দিয়ে শান্ত, সমাহিত কিন্তু সুরেলা কণ্ঠে গান ধরলো। নীচু স্বরের গান। বিষাদময়। একটি নিঃসঙ্গ বালক গভীর রাতে নক্ষত্রের আলোয় অরণ্যের বিপদকে তুচ্ছ করে এগিয়ে চলেছে এক রহস্যপুরীর দিকে, যেখানে তার স্নেহময়ী মা বন্দী হয়ে আছে এক নিষ্ঠুর নিয়তির ষড়যন্ত্রে। ফায়জার গলা ভারী হয়ে এলো। নিজের অজান্তেই তার চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। এন্ডিকে দেখলে বোঝা যায় না তার হৃদয়ে এমন অসম্ভব দুঃখবোধ জমা হয়ে আছে। একটু লক্ষ্য করতে ছেলেটির ভেজা চোখজোড়া তার নজর এড়ায় না। সে নিজের অশ্রু ঢাকবার জন্য অন্যদিকে ফিরে থাকে।

ডিটেকটিভ কোডি কিংবা জোন, দু'জনার কেউই ভাবেনি যে দলটা এতো বড় হয়ে যাবে। আসবার কথা ছিলো শুধুমাত্র টমের, কারণ সে প্রথম কেবিনটার অবস্থান জানে। শেষ মুহূর্তে অমর সাথে আসতে চাইলো। তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সে সাথে থাকলে ভালো ছাড়া মন্দ হবার কোন সম্ভাবনা নেই। অনীতাও জেদ ধরলো আসার জন্যে। ফায়জা তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। অমর গেলে সে কেন যাবে না। জেসলিনও দলে ভিড়েছে। এন্ডি নাকি তার এক্স–বয়ফ্রেন্ড। নিকটবর্তী শহর থেকে একজন ডেপুটি শেরিফকেও সাথে নিয়ে নিয়েছে তারা। তার নাম রবার্ট, বয়স মধ্য–বিশ, বেশ পেশীবহুল শরীর। তার হাতে একটা রাইফেল এবং রেডিও। সে এই এলাকা বেশ ভালোভাবে চেনে যদিও এন্ডির কেবিনটা কখনো চোখে পড়েনি। এই বিস্তৃত পার্বত্য এলাকায় ছোট্ট একটা কেবিন চোখে পড়াটাই অস্বাভাবিক। টম সঠিক পথটা খুঁজে বের

করতে পারেনি কাঞ্চামাগাস হাইওয়ে থেকে। সে খানিকটা আন্দাজের উপর ভর করে একটা রাস্তা নির্দেশ করেছিলো। সেই রাস্তা ধরে মাইল খানেক ড্রাইভ করে এসে সুবিধামতো একটা জায়গায় গাড়ী রেখে জঙ্গলে ঢুকেছে ওরা। জঙ্গলের ভেতরে বহু পায়ে চলা পথ নানানদিক থেকে এসে কোথাও না কোথাও মিশে। টম আশা করছে এমনি কোন একটা সংযোগস্থলে পৌঁছাতে পারলে সে কেবিনের পথটা খুঁজে পাবে। না পেলে সর্বনাশ!

পাহাড়ি উচুঁ নীচু, এবড়ো খেবড়ো পথ। দু' পাশে ঘন হয়ে জন্মে আছে অসংখ্য বৃক্ষ। ঝোপ ঝাড়ে ঘষা লেগে প্রায় সবারই হাতে পায়ে ক্ষত তৈরী হয়েছে। একমাত্র রবার্ট ছাড়া দলের কেউই বিশেষ আনন্দে নেই।

কোডি হাঁপ ছেড়ে বলেই ফেললো –যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে অনেক কঠিন ব্যাপার।

জোন ট... দৃষ্টি হানলো। –দু'ঘন্টা ধরে সমানে হাঁটছি। আর কতদূর, টম?

টম কাঁচুমাচু মুখে বললো –বোধ হয় ভুল ট্রেইল নিয়েছি। কোন কিছুই পরিচিত মনে হচ্ছে না।

অনীতার অবস্থা সবচেয়ে নাজুক। নাচানাচিতে সে ওস্তাদ। সারারাত শরীর দোলাতে পারবে। কিন্তু এই জঙ্গলের মধ্যে ডাল–পালার খোঁচা খেতে খেতে অনির্দিষ্টের পানে হাঁটা এর কোন অর্থ হয়? মুখ ফুটে এতক্ষণ অভিযোগ করতে পারছে না দুটি কারণে। প্রথমত ফায়জাকে উদ্ধার করাটা প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত একরকম জোর করেই সাথে এসেছে সে এবং জেসলিন। জেসলিন এখন পর্যন্ত মুখ বুজে সব সহ্য করছে। সে নিজেকে দুর্বল প্রমাণ করতে আগ্রহী নয়। কিন্তু টমের মন্তব্য শুনে এবার সে রাগ ঝাড়ার খানিকটা সুযোগ পেলো।

–কি যা তা বলছো তুমি? পথ চেনো না তুমি? আবার পিছু ফিরতে হবে নাকি? তোমার কোন কান্ডজ্ঞান আছে? আর কতদূর হাঁটতে হবে?

টম হতাশ মুখে বললো –আমার কি দোষ। আমি চার–পাঁচ বছর আগে একবার গিয়েছিলাম। কিন্তু এটা নিশ্চিতভাবেই জানি যে কেবিনটা এদিকেই কোথাও।

রবার্ট বেশ ফূর্তির মধ্যে আছে। তার স্বাভাবিক, সতেজ ব্যবহার দেখলেই বোঝা যায় বন–জঙ্গল তার পছন্দ। সে দৃঢ় গলায় বললো–আমার মনে হয় আমাদের একটু পিছিয়ে গিয়ে অন্য ট্রেইলটা নেয়া উচিৎ। এই ট্রেইলটি আমার খানিকটা পরিচিত। কখনো কোন কেবিন দেখেছি বলে মনে করতে পারছি না।

টম যখন এই প্রস্তাবে কোন আপত্তি করলো না, তখন দলের অন্য কেউও আপত্তি করবার কোন কারণ দেখলো না। টমের দিকে অগ্নি দৃষ্টি হেনে ক্লান্ত ভঙ্গিতে উল্টো ঘুরলো দলটা। শেষ জাংশনটা প্রায় আধা মাইল পেছনে রেখে এসেছে ওরা। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে এই পথ নস্যি, কিন্তু এখন রীতিমতো শরীরে জ্বালা ধরে যাচ্ছে।

জাংশনটিতে পৌঁছে তিনটা ট্রেইলের প্রত্যেকটিকে ভালো মতো পর্যবেক্ষণ করলো টম। চারিদিক তাকিয়ে গাছপালার অবয়ব স্মৃতির সাথে মেলানোর চেষ্টা করছে সে, বিশেষ একটা সফল হচ্ছে না। চার–পাঁচ বছর কম সময় না।

কোডি অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললো–টম, আমাদেরকে কি সবগুলো ট্রেইলই খুঁজতে হবে?

...। সে খুক খুক করে কেশে বললো –এন্ডি মনে হয় ইচ্ছা করে

ট্রেইল... উ ওর কেবিনটা খুঁজে না পায়। আমার মনে হচ্ছে কেবিনে যাবার পথে বিশাল একটা ওক গাছ দেখেছিলাম।

অনতিদূরে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ওক গাছের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলো ও। ঐটাই সেই ওক গাছ হতে পারে।

অনীতা চিবিয়ে চিবিয়ে বললো–নিশ্চিত হয়ে বলো। হাঁদার মতো সারা দুনিয়া হাঁটতে পারবো না। আমার পায়ের নীচে মনে হয় ইতিমধ্যেই ফোসকা পড়ে গেছে।

জেসলিন বোধহয় এই ধরনের একটা সুযোগেরই অপেক্ষা করছিলো। সে টমের পক্ষ নিলো।—ওতো চেষ্টা করছে। এতো মেজাজ দেখানোর কি হলো?

অনীতা ঠোঁট বাঁকালো।—এবার বুঝি টমের প্রেমে পড়ে গেলে?

জেসলিন কোমর বেঁধে নামলো।—একদম বাজে কথা বলবে না। তোমার জন্যেই এই ঝামেলায় পড়েছি আমি। তুমি যদি তখন আসার জন্যে জেদ না ধরতে আমি কখনো আসতাম না। ডিটেকটিভরা তো আমাদেরকে নিতেই চায়নি। এখন মাঝপথে এসে ঝগড়া করো না। ভালো না লাগলে ফিরে যাও।

অমর জানে এই দু'জন একবার ঝগড়া শুরু করলে চুলোচুলি পর্যন্ত গড়াতে পারে। সে ঝট্ করে এগিয়ে এসে দু'জনার মাঝে দাঁড়ালো।—মেজাজ খারাপ করার কোন প্রয়োজন নেই। আমার ধারণা আমরা খুব কাছাকাছি চলে এসেছি।

রবার্ট এতক্ষণ প্রায় কোন কথাবার্তাই বলেনি। সে হঠাৎ সবাইকে অবাক করে দিয়ে সরস মন্তব্য করলো—একটা শত্রূ তার আঁচ পাচ্ছি আমি। সমস্যাটা কাকে নিয়ে?

অনীতা তার উপরেই ঝাল ঝাড়লো।—অফিসার, নিজের কাজ করো। ফায়জাকে খুঁজে বের করো। মেয়েদের ব্যাপারে নাক গলিও না।

জেসলিন রহস্য ফাঁস করলো।—এন্ডিকে নিয়ে। ও আমার এক্স–বয়ফেন্ড্র।

অনীতা ধমকে বললো—দিয়েছে তো ছেড়ে। এখনতো ফিরেও তাকায় না।

রবার্ট মুচকি হেসে বললো—মনে তো হয় না তোমাদের কারো জন্যেই তার বিশেষ প্রীতি আছে।

অনীতা থমথমে মুখে বললো—তুমি কি আমাকে ক্ষ্যাপানের চেষ্টা করছো, অফিসার?

রবার্ট বি[...]প থাকারই সিদ্ধান্ত নিলো।

কোডি এ[...] জড়াতে চায় না। তার নিজেরই বহুদিন হাইকিং করবার অভ্যাস নেই। পেশিতে একটু টানই পড়ছে। সে টমকে লক্ষ্য করে বললো

—কোনদিকে যেতে হবে টম?

টম একটা দীর্ঘশ্বাস নিলো।—ঐ ওক গাছের দিকেই যাই।

অনীতা বিড়বিড়িয়ে উঠলো—এইবার যদি ভুল করো তোমার ঘাড়ে উঠে বসবো আমি।

টম নিরীহ কণ্ঠে বললো—সেটা নিতান্ত মন্দ হবে না।

—তাতো বটেই। তোমার কল্পনায়!

বেশ একটি হাসির রোল পড়ে গেলো। এটার দরকার ছিলো। সামান্য হলেও একটু সজীবতা ফিরে এলো সবার মধ্যে। টম চলেছে সবার আগে আগে। কোডি এবং জোন প্রায় তার শরীর ঘেঁষে। তাদের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি চারিদিকে সূত্র খুঁজছে। যে সমস্ত ট্রেইলে মানুষ চলাফেরা করে সেখানে কিছু না কিছু চিহ্ন থাকেই। নরম মাটিতে পদচিহ্ন, ঝোপঝাড়ে জামাকাপড়ের ক্ষুদ্রাংশ, ভাঙ্গা ডালপালা, চেপে যাওয়া ঘাস—এমনি আরো অনেক কিছু। তাদের সামান্য পেছনে অমর ও জেসলিন বেশ খানিকটা দূরত্ব বজায় রেখে হাঁটছে। নিজের অজান্তেই রবার্টের পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করেছে অনীতা। একটা দুইটা করে কথাও জমে উঠেছে। খুব শীঘ্রই সে আবিস্কার করলো, পুলিশ হলেও রবার্টের মধ্যে চমৎকার রসবোধ আছে। তার কষ্টবোধ খুব শীঘ্রই উবে যেতে শুরু করলো।

এগার

কুল হার্ট-এ আসাটা ঠিক পরিকল্পনা করে হয়নি। আগের দিনের মাছ ধরার রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার পর এন্ডি আবার নৌকা নিয়ে বের হবার প্রস্তাব দিতেই ফায়জা রাজী হয়ে যায়। মাছ ধরা তেমন হলো না। গতকালের মাছগুলিই অধিকাংশ রয়ে গেছে। এন্ডি ধরে ধরে ছেড়ে দিচ্ছে। ফায়জাও ছেড়ে দিলো। ধরে ছেড়ে দেয়ার মধ্যে যে একটা অভূতপূর্ব আনন্দ আছে সেটা সে অচিরেই অনুভব করতে শুরু করলো। মাছ ধরার প্রাথমিক রোমাঞ্চটা কেটে যেতে তার রীতিমতো কষ্ট হতে লাগলো। দূর্ভাগ্য মাছগুলোর জন্য। এই তীক্ষ্ণ বড়শিগুলো ওদের মুখে গেঁথে গেলে নিশ্চয় প্রচুর যন্ত্রণা হয়। এন্ডি অবশ্য তাকে আশ্বস্ত করেছে এই বলে যে মাছেদের নার্ভাস সিস্টেম খুবই নিম্নগোত্রের এবং তারা যন্ত্রণা অনুভব করতে পারে না। না পারলেই ভালো।

ফায়জা মাছ ধরার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে জলপ্রপাতে যাবার বায়না ধরেছিলো। এন্ডি তাতে কোন আপত্তি করেনি। ফায়জা আগে থেকেই গোসল করবার একটা ইচ্ছা মনে মনে পোষন করছিলো। এখানে এসে শীতল পানির ঝাপটা মুখে লাগতে আর নিজেকে সামলাতে পারলো না। সে এন্ডিকে কিছুক্ষণের জন্য সেখান থেকে সরে যাবার হুকুম দিলো। এন্ডি বিশেষ আপত্তি করলো না। মুচকি হেসে নিকটবর্তী একটা ট্রেইল ধরে ঠিক পাশের পাহাড় বেয়ে উপরের দিকে উঠে গেলো। ফায়জা এন্ডি চলে গেছে নিশ্চিত হয়ে পানিতে নামলো। জামা-কাপড় খুলতে পারলো না লজ্জার মাথা খেয়ে। কে জানে এন্ডির মনে কি আছে? কাছেই একটা পাখী খুব সুর করে করে ডাকছে। অপরিচিত পাখী। অনেক খুঁজেও তার দর্শন পাওয়া গেলো না। নিশ্চয় ছোট পাখী। গাছপালার আড়ালে ঘাপটি মেরে বসে মনের আনন্দে টু-টু করছে। ফায়জা সাঁতারের 'স' ও জানে না। ফলে সে তীর থেকে বেশী দূরে যাবার সাহস পাচ্ছে না। কোমর সমান পানিতে দাঁড়িয়ে মনের আয়েশ মিটিয়ে কয়েকটা ডুব দিলো। এমন পরিষ্কার পানি, তলার নুড়ি পাথরগুলো স্পষ্ট দেখা যায়। ফায়জা ডুব দিয়ে নুড়ি তুলতে লাগলো। নানান রঙের পাথর। লাল, সবুজ, নীল, বেগুনি, সাদা। ওর পছন্দের রং সবুজ। ও খুঁজে খুঁজে সবুজ রঙের পাথরগুলো সংগ্রহ করতে লাগলো। খুব শীঘ্রিই দু'হাত ভরে উঠলো ওর।

এন্ডি প্রায় খাড়া ট্রেইলটা ধরে অনায়াসে ছোটখাটো পাহাড়টার চূড়ায় উঠে এলো। বড়জোর শ'দুয়েক ফুট উঁচু হবে। চূড়ায় গাছপালার ভীড়টা কিঞ্চিৎ কম। দৃষ্টি বহুদূরে চলে যায়। সামনের লেকটা প্রায় পুরোটাই নজরে পড়ে। দূরে কেবিনটা সামান্য দেখা যায়। চারিদিকে যতদূর দৃষ্টি চলে পাহাড় এবং জঙ্গল। 'ফল' এর শুরু। গাছের পাতায় রঙের ছোপ লাগতে শুরু করেছে। ঘন সবুজের কার্পেটে ছোপ ছোপ হলুদ এবং লালের চিহ্ন। চমৎকার দেখায়! এই স্[...]খুবই প্রিয়। কেবিনে এলেই সে এখানে এসে কিছুক্ষণ চারিদিকের দৃশ্য দেখে যায়।

প্রথম দৃষ্টিতে সে ক্ষুদ্র চলমান বিন্দুগুলোকে মানুষবলে ঠাহর করতে পারলোনা। এই সমস্ত পাহাড়ে প্রচুর হরিণ থাকে। মাঝে মাঝে দল বেঁধে চলাফেরা করে। কিন্তু তার মনে একটা সন্দেহ দেখা দিলো। সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বিন্দুগুলোকে কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করলো। সেগুলোকে তার কেবিনের দিকে অগ্রসর হতে দেখে তার সমস্ত সন্দেহ উবে গেলো। হরিণের দল সাধারণত লেকে পানি খেতে যায়। তারা কখনো কেবিনের ধারে কাছে যায় না। সে একটু আশ্চর্যই হলো। পুলিশ তাকে খুঁজে পাবে এটা সে চিন্তাও করেনি। সে ফিরতি পথ ধরলো।

এন্ডিকে পড়িমড়ি করে দৌড়ে আসতে দেখে ফায়জা ঘাবড়ে গেলো। ভেজা জামা-কাপড়ের কথা ভুলে গিয়ে বললো -কি হয়েছে এন্ডি?

–আমাদেরকে এখুনিই রওনা হতে হবে। জলদি।

–কেন? কি হলো হঠাৎ?

–পথে যেতে যেতে বলবো। চলো। একদম সময় নেই হাতে।

ফায়জা বিহ্বল কণ্ঠে বললো–এভাবেই যাবো? আমার জামা–কাপড় তো সব কেবিনে।

–হ্যাঁ, কেবিনে একবার থামতেই হবে। নৌকা নেবো না আমরা। এদিক দিয়ে একটা শর্টকার্ট আছে। আসো।

সে ফায়জার হাত ধরে লেকের পাশ ধরে দৌড়াতে লাগলো। ভেজা কাপড়ে তার সাথে তাল মেলাতে রীতিমতো গলদঘর্ম হচ্ছে ফায়জা। কিন্তু এন্ডির সেদিকে খেয়াল নেই। তাকে বেশ উত্তেজিত মনে হয়। তবে কি পুলিশ ওদেরকে খুঁজে পেলো? পাহাড়ের উপর থেকে নিশ্চয় কিছু দেখেছে এন্ডি। হোঁচট খেতে খেতে নিজেকে সামলিয়ে নিলো সে। এই পরিস্থিতিতে তার কি করা উচিৎ? এন্ডিকে দেরী করিয়ে দেবার চেষ্টা করবে? ও যদি ক্ষেপে যায়? অদ্ভুৎ কিছু করে বসে? ফায়জা দিশেহারা বোধ করে।

চুলের কাঁটার মতো একটা বাঁক ঘুরতেই কেবিনটা নজরে পড়লো। নৌকায় যাবার সময় মনে হয়েছিলো অনেক দূরে। এখন বেশ দ্রুত পৌঁছে গেলো মনে হলো ফায়জার। চারিদিকে তাকিয়ে কোন জনমনিষ্যি চোখে পড়লো না ওর। আশা করাটাও উচিৎ হয় নি। যদি পুলিশকে আসতে দেখে থাকে এন্ডি, তারা নিশ্চয় এখনো বেশ দূরে। নইলে কোন অবস্থাতেই ঝুঁকি নিয়ে কেবিনে ফিরতো না সে। ফায়জাকে কোন রকমে ভেজা কাপড় বদলানোর সুযোগ দিলো এন্ডি। দ্রুতহাতে [illegible] চকায় বেঁধে ফায়জাকে কোন প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে তার হাত [illegible] থেকে বেরিয়ে এলো। প্রায় অদৃশ্য একটা ট্রেইল ধরে মুহূর্তের মধ্যে গভীর বনের মধ্যে মিলিয়ে গেলো ওরা। ফায়জা বাধ্য মেয়ের মতো এন্ডিকে অনুসরণ করলো। অনেক ধরনের প্যান মাথায় এলেও কোনটাই করবার সাহস পেলো না। এন্ডির কাছে আগ্নেয়াস্ত্র আছে। রাগের মাথায় সে যে সেটা ব্যবহার করবে না তার নিশ্চয়তা কি? তাছাড়া সত্যি সত্যিই যে পুলিশ আসছে তারইবা নিশ্চয়তা কি? কোন বদ মানুষের দলওতো হতে পারে। এন্ডিতো কিছুই খুলে বলেনি। যা আছে কপালে!

ভুল করেছি ভালোবেসে

এন্ডির কেবিন থেকে শ'খানেক ফুট দূরে এসে থামলো দলটা। কেবিনটা এখান থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। কোন জনমনিষ্যির ছায়া নেই কোথাও।

কোডি হাঁফ ছেড়ে বললো –শেষ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া গেল।

রবার্ট সতর্ক কণ্ঠে বললো–আমাদের একটু সতর্ক হওয়া উচিৎ।

অমর বললো–এন্ডি খুবই ভদ্রস্বভাবের ছেলে। কারো কোন ক্ষতি করবার ক্ষমতা ওর নেই।

কোডি টিপ্পনি কাটলো–খুব শীঘ্রিই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

জোন বললো–মেয়েরা এখানেই থাকুক। টম এবং অমর আমাদের সাথে আসুক, দেখি আলাপ করা যায় কিনা।

রবার্ট সাবধানী কণ্ঠে বললো–আমাদের ফাঁকা জায়গা দিয়ে না হাঁটাই ভালো। সাবধানের মার নেই।

টম অমরের কথার প্রতিধ্বনি তুললো–এন্ডি কারও ক্ষতি করবার মতো ছেলেই নয়। তোমরা খামাখা ভয় পাচ্ছো।

কোডি মুখ বাঁকালো। –হ্যাঁ, তিনি সাধু–সন্ন্যাসী। শুধু মন্দের মধ্যে এইটুকুই যে, তিনি নারী অপহরণ করে থাকেন। সাবধান হওয়াই ভালো। অফিসার রবার্ট, তুমি এখানেই থাকো।

এদিকটা পাহারা দাও। আমি আর জোন কেবিনের দিকে যাচ্ছি। অমর এবং টম, তোমরাও আসতে পারো, কিন্তু আমাদের পিছু পিছু। সর্বক্ষণ গাছের আড়ালে থাকবে।

খুব ধীরে ধীরে, গাছ থেকে গাছে, ঝোপ থেকে ঝোপে সরে সরে কেবিনের নিকটে এলো ওরা চারজন।

অমর ডাকলো–এন্ডি! আমি অমর।

টমও গলা মেলালো। –এন্ডি, তুমি আছো ভেতরে?

কোন প্রত্যুত্তর এলো না। বেশ কয়েকবার চেষ্টা করলো ওরা। ফলাফল একই। কোডি বললো, জোন, তুমি সামনের দিকটা পাহারা দাও। আমি পেছন দিক দিয়ে যাচ্ছি।

কোডি গাছের আড়াল নিয়ে কেবিনটাকে পার হয়ে পেছনদিকে চলে গেলো। অমরের কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে–এন্ডি। ভেতরে থাকলে উত্তর দাও।

কেউ উত্তর দিলো না।

কোডি খুব সাবধানে পেছনের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। খোলাই মনে হলো। ভেড়ানো সম্ভবত। হালকা ধাক্কা দিতেই হা করে খুলে গেলো দরজা। পিস্তল বাগিয়ে ধরে রান্নাঘরে ঢুকলো কোডি। ময়লা থালা–বাসন–হাড়ি–পাতিল নজরে এলো। লিভিংরুম কেউ নেই। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারিদিক পর্যবেক্ষণ করতে করতে করিডোরে চলে এলো কোডি। বেডরুম দু'টাই চেক করলো। মেঝেতে রাখা ভেজা তোয়ালে এবং ফায়জার ভেজা জামা–কাপড় সহজেই নজরে পড়লো। দ্রুত হেঁটে সামনের দরজা দিয়ে উঠোনে বেরিয়ে এলো সে।

ডিটেকটিভ জোন অমর ও টমকে সাথে নিয়ে এগিয়ে এলো। কোডি বললো –ফায়জাকে নিয়ে পালিয়েছে। খুব বেশীক্ষণ আগে নয়। ভেজা জামা–কাপড় দেখলাম ভেতরে। এখনও পানি গড়াচ্ছে। এন্ডি নিশ্চয় আমাদেরকে আসতে দেখেছে।

জোন বললো–সেক্ষেত্রে খুব বেশী হলে দশ–পনেরো মিনিট আগে রওনা দিয়েছে ও।

টম হতাশ গলায় বললো–দশ–পনেরো মিনিট কম সময় নয়। ও এই এলাকাটিকে ওর হাতের তালুর মতো চেনে।

কোডি বললো –ও নিশ্চয় ওর দ্বিতীয় কেবিনটার দিকেই যাবে। টম, সেটা যেন কতদূর বলেছিলে?

টম বললো–মাইল বিশেক তো হবেই।

জোন বললো–আমাদের সাপাই দরকার। আমরা তো সাথে কিছুই নিয়ে আসিনি। এতোদূর যেতে হবে কে জানতো।

কোডি হাত ছানি দিয়ে ডাকতে অনীতা এবং জেসলিনকে নিয়ে ওদের দিকে এগিয়ে এলো

ভুল করেছি ভালোবেসে

কোডি তাকে লক্ষ্য করে বললো–অফিসার রবার্ট, আমাদের একটা কুকুর, একজন ট্রাকার এবং দু–তিন দিনের মতো সরবরাহ দরকার। ব্যবস্থা করতে পারবে মনে হয়?

–স্টেশনে কল করতে হবে। পালিয়েছে এন্ডি?

–হ্যাঁ। আমাদের ধারণা ওর অন্য কেবিনটার দিকেই যাচ্ছে। সেটা টমের ভাষ্য অনুযায়ী মাইল বিশেক দূরে।

–সাপাই পেতে খুব দেরী হবে মনে হয় না। কুকুর ও ট্রাকারও পাওয়া যাবে।

সে একটু ফাঁকা জায়গায় সরে গিয়ে রেডিওতে স্টেশনের সাথে যোগাযোগ করবার চেষ্টা করতে লাগলো।

অনীতা এবং জেসলিনের উদ্বিগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে কোডি বললো –যারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে তাদের এখান থেকেই ফিরে যাওয়া উচিত। সামনের পথ আরো ভয়ানক হবে।

অনীতার অহমিকায় লাগলো। –প্রশ্নই আসে না। ফায়জাকে না নিয়ে কোথাও যাচ্ছি না।

জেসলিন শুকনো কণ্ঠে বললো –তা তো বটেই। ফিরে যাবার প্রশ্ন উঠছে কেন?

কোডি শ্রাগ করলো। –তোমাদের কথা জানি না, আমি ডিটেকটিভ না হলে এক দৌড় দিয়ে পগার পার হয়ে যেতাম। বুড়ো হাড়ে এই যন্ত্রণা সহ্য হয় না।

সে একটা গাছের নীচে ধপাস করে বসে পড়লো। আরো বিশ মাইল হাঁটা কি চাট্টিখানি কথা! ফিরতি পথেরও ধকল আছে। কি আর করা!

একটানা ঘন্টাখানেক দৌড়ে ভয়ানক ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ফায়জা। পথে বেশ কয়েকবার থামতে চেয়েছে সে কিন্তু এন্ডি তাকে বিশ্রাম নেবার কোন সুযোগ দেয়নি। একরকম টেনে হেঁচড়ে তার সাথে গতি বজায় রাখতে বাধ্য করেছে। শেষ পর্যন্ত ফায়জার ফ্যাকাশে মুখ এবং অবসন্ন শরীর দেখে বাধ্য হয়ে থামলো এন্ডি। বেচারি এভাবে খুব বেশীক্ষণ টিকবে না। তাছাড়া কেবিন থেকে বেশ অনেকখানি পথ অতিক্রম করে এসেছে ওরা। ঝট্ করে ওদেরকে খুঁজে বের করতে পারবে না অনুসরণকারী দলটা। ঘাসের উপরে সটান শুয়ে পড়লো ফায়জা। তার মনে হচ্ছে এখুনি ... যাবে। সমস্ত শরীরে ঘামের উৎকট উপস্থিতি। গন্ধে নিজেরই বমি হবার জোগাড়। এন্ডি নিজেও স্বল্প দূরত্ব বজায় রেখে বসলো।

ফায়জা হাঁসফাঁস করতে করতে বললো –আর এক পাও যেতে পারবো না। আমি মারা যাবো।

এন্ডি বললো–কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে রওনা দেয়া যাবে।

–পুলিশ পিছু নিয়েছে, তাই না?

–হ্যাঁ। কিভাবে ওরা কেবিনের হদিস পেলো সেটাই ভাবছি। একমাত্র টমই জানে কেবিনের অবস্থান। পুলিশ নিশ্চয় ওকে কব্জা করেছে।

–টম কে?

–আমার ফুপাতো ভাই। টেক্সাসে কাজ করতো। নিশ্চয় সব ছেড়ে ছুড়ে ফিরে এসেছে। এটাই ওর স্বভাব। কোন কাজে টিকে থাকতে পারে না। খোঁজ নেয়া উচিৎ ছিলো আমার। যাই হোক, দ্বিতীয় কেবিনটি কোথায় ও জানে না।

–আমি যদি তোমার সাথে যেতে না চাই?

–তোমার পা ধরে ভিক্ষে চাইবো আমার সাথে যাবার জন্য।

মলিন একটা হাসি দিলো ফায়জা। এই জাতীয় কথার অর্থ খুবই পরিষ্কার। তাকে ভালোয় ভালোয় ছেড়ে দেবার কোন ইচ্ছা নেই এন্ডির।

ঘন্টাখানেক হাঁটছে, অল্পক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে আবার হাঁটছে। পথ যেন ফুরায় না। বনের মধ্যে খুব দ্রুতই যেন অন্ধকার গড়িয়ে এলো। চারিদিকে ঘরে ফেরা পাখিদের কলকাকলিতে ভরে উঠলো। ক্লান্ত পায়ে এন্ডির পিছু পিছু হাঁটছে ফায়জা। তার সাথে তাল মিলিয়ে গতি কমিয়ে দিয়েছে এন্ডি। খুবই ঢিলে তালে এগুচ্ছে ওরা। কিন্তু ফায়জার উদভ্রান্ত অবয়ব দেখে আর চাপ দেবার সাহস পেলো না ও।

ফায়জা উদাসীন কণ্ঠে বললো –আজ হোক কাল হোক ওরা আমাদের খুঁজে পাবেই।

–ঝট্ করে পাবে না।

–তোমার এই কেবিনটা কতদূরে?

প্রথম কেবিন থেকে ষোল মাইলের মতো।

–বল কি? সে তো অনেক পথ!

–রাতে এক জায়গায় থামবো আমরা।

–এই বনের মধ্যে?

–সামনে আমার একটা কুঁড়েঘর আছে। সেখানেই রাতটা কাটাবো। এই পথে বছরে বার দুই–তিন যাওয়া পড়েই আমার। সেজন্যেই ঘরটা বানিয়ে রেখেছি।

–কেন যাও ওখানে? আবার বলো না, তোমার বাবা–মা ওখানে থাকেন?

–নিজেই দেখবে।

এন্ডি এড়িয়ে যাবার জন্য শীষ বাজাতে শুরু করলো। চমৎকার শীষ বাজায় সে। একটা অচেনা গানের সুর তুলছে। নিজের অজান্তেই তার সাথে গুনগুনিয়ে উঠলো ফায়জা। গানটা জানা নেই। কিন্তু তাতে বিশেষ অসুবিধা হচ্ছে না। রাত–বিরেতে বন জঙ্গল ভেঙ্গে হাঁটতে হবে না শুনে ওর মনটা অনেক ভালো লাগছে।

তিন চার ঘন্টা নষ্ট হলেও যা যা চেয়েছিলো সবই পাওয়া গেলো। কোডি এবং জোন দু'জনাই রবার্টের উপর খুবই সন্তুষ্ট হলো। ছেলেটা কাজের আছে। কুকুরসহ ট্রাকার এসে হাজির হয়েছে। সপ্তাহখানেকের সাপাই চলে এসেছে। খাবার–দাবার, পানীয়, কিছু কম্বল। রাতে ঠান্ডা পড়তে পারে। এন্ডি এবং ফায়জার কাপড় শোঁকাতেই কুকুর কে-নাইন ও ট্রাকার অফিসার ঠিকঠাক তাদের পথ খুঁজে পিছু নিলো। তাদের অনুসরণ করলো পুরো দলটি। প্রথমদিকে রীতিমতো দৌড়াতে হলো সবাইকে কে–নাইনের সাথে তাল মেলানোর জন্য। সবার নাজুক অবস্থা দেখে ট্রাকার অফিসার প্যাট্রিক থমসন কুকুরের রাশ একটু টেনে ধরলো। সবাইকে সঙ্গ ধরার সুযোগ দিলো সে। সবচেয়ে বেশী পিছিয়ে পড়েছে অনীতা এবং রবার্ট। তাদের খোশ–গল্প দেখে মনে হচ্ছে জঙ্গলে হাওয়া খেতে এসেছে। দলের বাকিদের চোখে পড়লেও কেউ বিশেষ আমল দিলো না। ওদের অছিলায় একটু বেশীক্ষণ বিশ্রাম পাওয়া যাচ্ছে। তাতেই সবাই খুশী। আবার চলা শুরু হতে অনীতা লজ্জার মাথা খেয়ে জিজ্ঞেস করে ফেললো–তো অফিসার, কোন মেয়েবন্ধু আছে নাকি তোমার? রবার্ট লাজুক গলায় বললো–রবার্ট বলেই ডাকো না। আর, না, আমার এই মুহূর্তে কোন বন্ধু নেই। বছর খানেক আগে আমার এক্সের সাথে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। তারপর থেকে ব্রত নিয়েছি ঝট্ করে কারো সাথে জড়াবো না।

–তোমার কপাল ভালো বলতে হবে। আমার দেখা পেয়ে গেলে। আর খুঁজতে হবে না। এবার ব্রত ভাঙতে পারো।

–নিশ্চয় [illegible]ী একটি মেয়ের জন্য কে না পাগল হবে?

–আমি [illegible] ভাবছি। তুমি অবশ্য সব মিলিয়ে মন্দ না।

রবার্ট মুচকি হাসলো। –সময় নাও। তাড়াহুড়ার কিছু নেই। আমার কোন তাড়া নেই।

–তাতো নেইই। তুমি এখন আমার প্রেমে পাগলপারা হয়ে আছো। ঠিক কিনা?

রবার্ট এই কথায় যারপরনাই আনন্দিত হয়ে হো হো করে হেসে উঠলো। তার সাথে অনীতাও কণ্ঠ মেলালো। বাকিরা কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাদের দিকে ফিরে তাকালো। অনীতা সপ্রতিভ ভঙ্গিতে হাত নাড়লো। জেসলিন বিড় বিড় করে কটু কিছু বললো। কেউ শুনলেও কোন মন্তব্য করলো না।

ট্রেইলটা হঠাৎ করেই পাহাড়ের শরীর বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করেছে। মোটামুটি খাঁড়াই। একটা বিশাল পাথরের উপর দিয়ে যেতে হবে। জেসলিনের অসুবিধা হচ্ছিলো দেখে অমর হাত ধরে টেনে তুললো তাকে। ঘষা খেয়ে সামান্য চামড়া ছিলে গেছে জেসলিনের। অমর উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললো –ঠিক আছো তো?

জেসলিন ক্লান্ত কণ্ঠে উত্তর দিলো–চলতে পারবো। পা জোড়া অবশ্য অবশ হয়ে আসছে। এতো হাঁটার অভ্যাস নেই।

অমর বিড়বিড় করে বললো–এন্ডি এতো দূর চলে আসবে কে জানতো? এমন গাধা জীবনে দেখিনি।

জেসলিন নীচু গলায় বললো–এটা আমার দোষেই হয়েছে। আমাদের ছাড়াছাড়ি না হলে কক্ষনো এমন হতো না।

–অযথা নিজেকে দোষ দিও না।

–হয়তো আমি ওকে যথাযথ বুঝবার চেষ্টা করিনি। তুমি তো ওকে ভালোমতোই জানো। ওর দরকার মা, প্রেমিকা নয়। মাকে বেশী পায়নি বলেই হয়তো এমনটা হয়েছে। কিন্তু আমি সেরকম হতে পারিনি। ফায়জার মধ্যে একটা কোমল মাধুর্য আছে। সেটাই হয়তো ওকে আকর্ষণ করেছে।

–হতে পারে। আমি যদি ঘুনাক্ষরেও কিছু টের পেতাম কক্ষনো এটা হতে দিতাম না।

তারা নীরবে হাঁটতে লাগলো।

বার

ভুল করেছি ভালোবেসে

পাহাড়ের গায়ের সাথে লাগোয়া এন্ডির গুপ্ত কুঠুরিতে ওরা যখন পৌঁছালো তখন গভীর অন্ধকার চারিদিকে। টর্চের আলো ছাড়া কিছুই দেখা যায় না। শেষের দিকে ফায়জা এতো ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো যে এন্ডি ওকে একরকম বহনই করেছে। ফায়জা কোন আপত্তি করেনি। মোঘলের হাতে যখন পড়েছেই, খানা তখন সাথে খেতেই হবে। শরীরে একটু হাত লাগলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। সত্যি কথা হলো, ওর হাঁটার শক্তি ছিলো না। ক্রমাগত চড়াই–উৎরাই–বেয়ে ওঠা নামা করা যে কতখানি কষ্টকর ব্যাপার হতে পারে সেটা সে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। এন্ডির কুঁড়েঘরটি মোটা মোটা কয়েকটা কাঠের খুঁটি এবং ডালপালা দিয়ে তৈরী। দড়ি দিয়ে বেশ কিছু চিকন লম্বা ডাল একসাথে বেঁধে ছাদ বানিয়েছে সে। পাহাড়ের শরীর ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকায় ছোট্ট কুঁড়েঘরটিকে বেশ মজবুতই দেখাচ্ছে। চারপাশে গাছপালা, ঝোপঝাড়ে ছেয়ে থাকায় ঝট্ করে সেটা চোখেও পড়ে না। ডালপালা দিয়ে তৈরী দরজাটা টেনে ফায়জাকে নিয়ে ভেতরে ঢুকলো এন্ডি। –এই আমার রাজপ্রাসাদ। আজকের রাতটা এখানেই কাটাতে হবে।

ফায়জা টর্চের আলোয় ভেতরটা দেখেই মুখ বাঁকালো। রাজপ্রাসাদই বটে। দশ বাই দশের চেয়ে বড় হবে না আকারে। ভেতরে পোকামাকড় ভর্তি, কয়েকটা পিঁপড়ের ঢিবিও চোখে পড়লো। এদের সাথে রাত্রিবাস করার চেয়ে বনের মাঝখানে বসে থাকাও ভালো। কিন্তু সে কোন মন্তব্য করলো না। চারিদিকে একটা আবরণ আর উপরে ছাদ যখন আছে তখন নীচে কিছু একটা বিছিয়ে রাতটা কাবার করে দিলেই হবে। কটুক্তি করে বেচারীর মন খারাপ করে দেবার অর্থ হয় না। সে ঘাসের উপরেই ধপাস করে বসে পড়লো। একটু না শুতে পারলে তার চলবে না।

এন্ডি কুঠিরে ঢুকেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। এক কোণ থেকে একটি কেরোসিনের লণ্ঠন বের করলো সে। দেখে নতুনই মনে হলো। সেটা জ্বালাতেই ভেতরটা বেশ আলোকিত হয়ে উঠলো। এন্ডি যে বলেছিলো এই পথে মাঝে মাঝেই যাতায়াত করে তাতে সন্দেহ করবার আর কোন কারণ দেখলো না ফায়জা। লণ্ঠনটাও সুন্দর করে পলিথিনে ঢেকে রেখে গিয়েছিলো। এন্ডি ঝট্‌পট আগুন ধরালো। দেয়ালগুলো কোনটাই নিশিছদ্র নয়। বস্তুত চারিদিকে ফাঁক–ফোকরে ভর্তি। ধোঁয়া নিয়ে কোন সমস্যায় পড়তে হলো না। আগুনটা বেশ কাজে এলো। ভেতরটা বেশ উষ্ণ, আরামদায়ক হয়ে উঠলো।

ফায়জার পায়ে প্রচন্ড ব্যথা হচ্ছে। এতক্ষণ একটা ঘোরের মধ্যে ছিলো বলে ব্যথাটা তেমন তীব্রভাবে টের পায়নি। কিন্তু শরীরটা এলিয়ে দিতেই ওর পেশীগুলো যেন একযোগে বিদ্রোহ করে বসলো। মনে হচ্ছে মাংসের ভেতরে কেউ যেন তীক্ষ্ণ ধার ছুরি দিয়ে খোঁচাচ্ছে। সে ছটফট করতে লাগলো। দুহাতে ম্যাসেজ করেও বিশেষ সুফল হলো না। বাধ্য হয়ে এন্ডির স্বরণাপন্ন হতে হলো। –পায়ে প্রচন্ড ব্যথা করছে।

এন্ডি ওর করু ণ অবস্থা আগেই লক্ষ্য করেছে। সে তার হাইকিংয়ের ব্যাগ ঘেঁটে বেশ কিছু জিনিষপত্র বাইরে বের করে ফেললো। কিন্তু যা খুঁজছিলো সেটা পাওয়া গেলো না।

সে হতাশ কণ্ঠে বললো–আমার কাছে একটা ব্যথার ঔষধ ছিলো, খুঁজে পাচ্ছি না। কেবিনেই রেখে এসেছি মনে হয়। কিন্তু চিন্তা র কিছু নেই। আমি কিছু বনৌষধি গাছ চিনি। এক মিনিটের মধ্যে ফিরে আসবো।

ফায়জাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে বাইরের অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো এন্ডি। টর্চলাইটের আলোটা ছুটাছুটি করছে ঝোপঝাড়ে। ফায়জার প্রচন্ড পিপাসা লেগেছে। সে আছড়ে পিছড়ে এন্ডির ব্যাগ পর্যন্ত এলো। ব্যাগের মধ্যে ওর পানির বোতলটা ঢুকিয়ে রেখে ছিলো, সেটা বের করলো। ঢক্ ঢক্ করে পুরোটা পানিই খেয়ে ফেললো। সিকি বোতলের মতো ছিলো। পিপাসাটা আপাততঃ মিটলো। বোতলটা ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখতে গিয়ে ব্যাগের মধ্যে একটা ছোট্ট বাক্সে ওর চোখ আটকিয়ে গেলো। এন্ডি ওষুধ খুঁজবার সময় নিশ্চয় ধাক্কা লেগে সেটার মুখটা খুলে গিয়েছিলো। ভেতরে একটা পুরানো লকেট, বেশ ময়লা। লকেটটার নীচে ভাঁজ করা একটা কাগজের টুকরা। একটু দ্বিধা করে লকেটটা হাতে তুলে নিলো ফায়জা। খুললো। একটা পারিবারিক ছবি। একজন পুর ষ, একজন নারী এবং একটি ছোট্ট ছেলে।

বাইরে এন্ডির পদশব্দ শোনা যাচ্ছে। ফিরে আসছে সে। দ্রু তহাতে লকেটটা বাক্সের মধ্যে চালান করে দিয়ে নিজের জায়গায় ফিরে এলো সে। এমন কোন কিছুই সে করতে চায় না যা দেখে এন্ডির মধ্যে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে। সাবধানে থাকাই ভালো।

এন্ডি হাতে বেশ কিছু পাতা নিয়ে ভেতরে ঢুকলো। একটা পাথরের উপরে সেগুলো রেখে অন্য একটা পাথর দিয়ে বাটলো। থেতলানো মিশ্রণটা নিয়ে ওর দিকে এগিয়ে এলো সে।

–এটা তোমার পায়ে ডলে দিলে ব্যথা কমে যাবে। ট্রাউজারটা টেনে উপরে তোলো। আমি লাগিয়ে দিচ্ছি। কথা দিচ্ছি কোন অশালীন কিছু করবো না।

ভুল করেছি ভালোবেসে

টেনে প্যান্টটা হাঁটুর উপরে তুললো। একরকম ঘাড়ে করে শেষের ছে, কোথাও হাত লাগতে কি আর বাকি আছে। পায়ে হাত দিলে আর কি আসে যায়!

এন্ডি ধীরে ধীরে মিশ্রণটা ওর পায়ে ডলে দিলো। প্রায় সাথে সাথেই পরিবর্তনটি লক্ষ্য করলো ফায়জা। ওর পেশীজোড়া শীতল হয়ে এলো। ব্যথাটা ঝট্ করেই অনেকখানি কমে গেলো।

এন্ডি বললো–ব্যথা কমছে?

–হ্যাঁ। একটু।

–নিশ্চয় ক্ষুধা পেয়েছে?

–একটা আস্ত গরু খেয়ে ফেলতে পারবো।

এন্ডি ওর হাইকিং ব্যাগে হাত চালায়। লকেটের বাক্সটা খোলা পড়ে আছে দেখে দ্রু ত সেটাকে বন্ধ করে ভেতরে ঢুকিয়ে রাখে। হাতড়ে দুটা মাঝারি আকারের কৌটা বের করে।

–আমার কাছে কিছু বিস্কিট এবং চকোলেট আছে। দেখো, চলবে কিনা।

ফায়জা সেগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। –এতক্ষণ ধরে লুকিয়ে রেখেছো, লজ্জা করে না তোমার? ক্ষুধায় আমার জীবন শেষ! দাও ওগুলো।

এন্ডি কৌটা দুটো ফায়জার হাতে ধরিয়ে দিলো। –ক্ষেপে যেও না। এগুলো আমি এই ধরনের পরিস্থিতির জন্যেই জমিয়ে রেখেছিলাম।

ফায়জা ঝট্‌পট কয়েকটা চকোলেট এবং বিস্কিট সাবাড় করে দিলো। এন্ডিকেও সাধলো। পেটে সামান্য কিছু হলেও খাদ্য পড়ায় তার মনটাও একটু চাঙ্গা হয়ে উঠলো। এতক্ষণের অবশ করা ক্লান্তি খানিকটা কেটে গিয়ে এই অভিনব পরিবেশের সৌন্দর্যটুকু সে দেখতে শুরু করলো। কুঁড়েঘরের ভেতরে আগুনের ক্ষুদ্র শিখাগুলো দেয়ালে বিশাল ছায়া–প্রতিচ্ছায়ার সৃষ্টি করেছে। শিখার সাথে ছন্দ মিলিয়ে ক্রমাগত দুলছে সেগুলো। বাইরে ঝি–ঝির ছন্দময় ডাক। গাছের পাতায় বাতাসের শির–শিরানি।

এন্ডি নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে বললো –জঙ্গলের এই সঙ্গীতের কোন তুলনা হয় না। শুনতে পাচ্ছো তুমি? অনুভব করছো?

–হ্যাঁ। আমার জন্য এটা একটা বিরল অভিজ্ঞতা। কখনো চিন্তাও করিনি এই জাতীয় পরিবেশে কখনো এসে পড়বো। কিন্তু একটা কথা না বলে পারছি না, আমাকে এইভাবে নিয়ে আসাটা তোমার উচিৎ হয়নি।

এন্ডি একটু চুপ করে থেকে বললো –তুমি যদি বলো তুমি নিজের ইচ্ছায় আমার সাথে এসেছো তাহলে কোন অপরাধ হয় না।

–কেন বলবো?

–আমার ঘাড়টা বাঁচানোর জন্য।

–এমন একটা কাজ করবার আগে সেটা চিন্তা করা উচিৎ ছিলো।

–করিনি তোমাকে কে বললো? আমি জানতাম তোমাকে বোঝাতে পারবো।

–কি করে এতোখানি বিশ্বাস করলে আমাকে?

–আমি জানতাম। কিভাবে জানিনা।

–আমি বিশ্বাস করতে পারছিনা, তুমি এতোবড় একটা ঝুঁকি নিয়েছো এই ভরসায়? তোমার কি মাথা খারাপ?

এন্ডি লাজুক মুখে মাটিতে আঁকিবুকি কাটতে থাকে। ফায়জা সেই মুখখানা দেখে ভীষন মজা পায়। এমন বয়সী, রোমাঞ্চ প্রিয় একটা পুরুষকে বালকের মতো মুখ করতে দেখলে মজা পাবারই কথা। দেখাচ্ছে খুব সুন্দর অবশ্য! এই কথা মনে হওয়ায় ফায়জা নিজেও একটু লজ্জা পায়।

অনুসরণকারী দলটাও রাতের জন্য এক জায়গায় আস্তানা গাড়লো। ফাঁকা জায়গা দেখে বড় করে আগুন জ্বালানো হয়েছে। সাথে করে আনা খাবার–দাবার গরম করা হচ্ছে। সবাই আগুনের চারপাশ ঘিরে বসে আছে। সারাদিনের ক্লান্তিময় যাত্রার পর সকলেই কম–বেশী শ্রান্ত। কথাবার্তা তেমন একটা হচ্ছে না। সকলেই ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে খাবারের জন্য অপেক্ষা করছে।

কোডি বেশ কিছুক্ষণ ধরেই শরীরের বিভিন্ন জায়গা ম্যাসেজ করছিলো। সে বললো –ওরা আমাদের থেকে কতখানি এগিয়ে আছে সেটাই ভাবছি।

রবার্ট বললো –চার–পাঁচ মাইলের বেশী হবে না। ফায়জার জন্য খুব দ্রুত চলতে পারবে না ওরা।

–রাতে আরো খানিকটা এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলে কেমন হয়?

প্যাট্রিক বললো –মন্দ হবে। এই পাহাড়ী জংলী এলাকা খুবই বিপদজনক হতে পারে। পারতপক্ষে অন্ধকারে চলাফেরা না করাই ভালো। কোথাও একটু হিসেবে ভুল হলে শ'খানেক ফুট পর্যন্ত গড়িয়ে পড়তে হতে পারে।

অনীতা সটান জানিয়ে দিলো –মরে গেলেও এই রাতের বেলা কোথাও যাচ্ছি না। আমার দু'চোখের পাতা ঘুমে জড়িয়ে আসছে।

জেসলিনও তার সাথে কণ্ঠ মেলালো। –আমারও।

কোডি বাকিদের কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে হার মানল। –ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমরা সবাই ক্লান্ত। সবারই কিছু বিশ্রাম দরকার। সুপটা মনে হয় হয়ে গেছে। যে যার মতো নিয়ে নাও।

পাশেই রাখা একটা সারি থেকে একটা পাস্টিকের বাটি তুলে নিলো সে, খানিকটা সুপ ঢেলে নিলো সুপের হাড়ি থেকে। অন্য একটা পাত্রে পাউরূটি রাখা ছিলো, সেখান থেকে দুই টুকরা তুলো নিলো। বাকিরাও কোন সময় নষ্ট না করে তাকে অনুসরণ করলো।

খাবার পরে আলাপ তেমন জমলো না। প্যাট্রিক প্রথম পাহারা দেবার পালা নিলো। বাকিরা এই সুযোগে ঘুমিয়ে নেবার চেষ্টা করলো। পরদিন কি ধরনের যন্ত্রণাময় অভিজ্ঞতা অপেক্ষা করছে কে জানে?

শেষ রাতের দিকে ঘুম ভেঙ্গে গেলো ফায়জার। ঠান্ডায় কুকড়ে গেছে সে। সাথে গরম কাপড় চোপড় কিছুই নেই। নড়াচড়া করে শরীরটা গরম করার চেষ্টা করলো, বিশেষ উপকার হলো না। আগুনটাও নিভে গেছে। আশেপাশে আর কোন ডালপালাও দেখলো না। এন্ডি যা কুড়িয়ে এনেছিলো সব শেষ হয়ে গেছে। এন্ডিকে দেখে ওর একটু হিংসাই হলো। দিব্যি গুটিসুটি মেরে অঘোরে ঘুমাচ্ছে। কোন কিছুতেই যেন ওর কোন অসুবিধা হয় না। কয়েকটা মুহূর্ত দ্বিধা করে একটা অভাবনীয় কাজই করে ফেললো ফায়জা। এন্ডির শরীর ঘেষে শুয়ে পড়লো। সে গভীর ঘুমে অচেতন, কিছুই টের পাবে না। খুব শীঘ্রই এন্ডির শরীরের উত্তাপ ওর শরীরে ছড়িয়ে পড়লো। অনেক স্বস্তি বোধ করলো ও। কখন আবার চোখের পাতা বুঁজে এলো জানলোও না।

যখন ঘুম ভাঙ্গলো তখন বেলা হয়ে গেছে। এখনও সূর্য ওঠেনি কিন্তু ভোরের স্বচ্ছ আলোয় চারিদিক আলোকিত। পাখীদের কল কাকলি শোনা যাচ্ছে। এন্ডি রওনা দেবার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। বস্তুত তার ডাকেই ফায়জার ঘুম ভেঙ্গেছে।

–ওঠো [illegible]াদেরকে রওনা দিতে হবে।

–এর [illegible] হয়ে গেলো? আসুক না ওরা। আমি বলবো স্বেচ্ছায় তোমার সাথে এসেছি। সব ঠিক হয়ে যাবে।

–ফ্লাইং রক কেবিনে পৌঁছানোর আগে ওদের হাতে ধরা পড়তে চাই না।

–ওখানে যেতেই হবে আমাকে?

–তোমার হাঁটতে অসুবিধা হলে আমি তোমাকে ঘাড়ে করে নিয়ে যাবো।

প্রমাদ গুনলো ফায়জা। ঘাড়ে নেয়ার ব্যাপারটা অভ্যাসে পরিণত না হওয়াই ভালো। এমনিতেই সকালে ঘুম থেকে উঠে ওকে কি অবস্থায় দেখেছে কে জানে। একটা ভুল বোঝাবুঝি হোক এটা ও চায়না। এন্ডিকে ভালো লাগে কিন্তু ওকে শারীরিক কোন ইঙ্গিত দেবার প্রশ্নই আসে না। কিন্তু ছেলেদের মনের খবর জানা তেমন কষ্ট নয়। তারা হ্যাংলার মতো তেমন ইঙ্গিত পাবারই অপেক্ষা করে। এন্ডির প্রতি আগ্রহ জাগতে দেখে নিজের প্রতিই বিরক্ত হলো ফায়জা।

ফায়জা বিছানা ছাড়লো। –না বাবা। আমি বরং হামাগুড়ি দিয়ে চলবো।

নিজেকে প্রস্তুত করতে বেশীক্ষণ লাগলো না। জুতাজোড়া পায়ে লাগিয়ে অপেক্ষমান এন্ডির পিছু নিলো ও। সতেজ, উচ্ছ্বল একটা সকালের শরীর কেটে বুনো পথ ধরে এগিয়ে চলে ওরা।

অফিসার প্যাট্রিক এবং কে–নাইনকে অনুসরণ করছে দলটা। সকালের আলো ফুটবার আগেই সবাইকে একরকম ঠেলে ঠেলে তুলেছে কোডি। যত তাড়াতাড়ি রওনা দেয়া যাবে তত তাড়াতাড়ি এন্ডিকে ধরা যাবে। এই বন–জঙ্গলে প্রয়োজনের চেয়ে এক মুহূর্ত বেশী কাটাতে সে রাজী নয়। কেউ বিশেষ আপত্তি করেনি। এগিয়ে যাবার তাগিদ সবাই অনুভব করছে। ফায়জাকে নিয়ে এন্ডি বেশী গভীর বনে ঢুকে গেলে এই যাত্রায় তাকে ধরা যাবে না। নতুন করে টাস্ক ফোর্স গঠন করতে হবে। ততদিনে ফায়জার কি পরিণতি হবে কে জানে? প্রায় ঘন্টা দুয়েক ধরে হাঁটছে ওরা। কথাবার্তা তেমন একটা হচ্ছে না। সারারাতের বিশ্রামের পর সবাই বেশ সতেজ অনুভব করছে। এই সুযোগে দ্রু ত পথ চলে যতখানি সম্ভব এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছে ওরা। কথা বলে দম নষ্ট করবার কোন অর্থ নেই।

কিন্তু দীর্ঘক্ষণ কথা না বলে থাকাটা অনীতার জন্য দুঃসাধ্য।

সে লজ্জার মাথা খেয়ে জিজ্ঞেস করে বসলো –কেবিনটা আর কত দুর? কোডি উত্তর দিলো– ভুল করেছি ভালোবেসে তাহলে আরো আট–দশ মাইল হবে।

–আট–দশ মাইল!

জোন বললো–তোমার বয়সীদের জন্য এটাতো কোন ব্যাপারই না। আমার মতো বুড়ো হাড়ে এই ধকল সইবে কিনা তাই ভাবছি।

কোডি বললো–ঠিকই বলেছো বন্ধু। এই ছোঁড়াকে ধরতে পারলে আর কখনো পাহাড়–পর্বতের চৌহদ্দি মাড়াবো না।

অনীতা হেসে ফেললো। –তোমরা এমন কিছু বুড়া হওনি।

কোডি টিপ্পনি কাটলো –সত্যিই বলছো? তাহলে অফিসার রবার্টের পাশ ছেড়ে এই বান্দার পাশে পাশে কেন হাঁটছো না?

এই কথায় অনীতার মুখ রক্তিম হয়ে উঠলো। সে লাজুক চোখে রবার্টের দিকে একবার তাকিয়ে মাটিতে চোখ রাখলো। রবার্টও লজ্জা পেয়ে অন্যদিকে ফিরলো। বোঝা গেলো অতি অল্প সময়েই তাদের মধ্যে বেশ হৃদ্যতা তৈরি হয়েছে। তাদের কান্ড দেখে সবাই হালকা গলায় হাসলো। অনীতাও ফিক্ করে হেসে ফেললো। ফায়জাকে খুঁজতে গিয়ে এমন একটা কাণ্ড হবে কে জানতো?

তের

দুপুরের দিকে একটা ছোটখাটো ক্যানিয়নের সামনে এসে থমকে দাঁড়ালো এন্ডি এবং ফায়জা। শ'খানেক ফুটের মতো গভীর, চলিশ–পঞ্চাশ ফুট চওড়া। একটা কাঠের সাঁকো চলে গেছে ক্যানিয়নের উপর দিয়ে। বড়জোর ফুট দু'য়েক চওড়া হবে সাঁকোটা। দু'পাশে দু'টা দড়ি সাঁকো বরাবর চলে গেছে। ফায়জা সোজা–সাপটা জানিয়ে দিলো–আমি কোন অবস্থাতেই ওটার উপর দিয়ে হাঁটছি না।

এন্ডি শ্রাগ করলো। –এটাই ওপারে যাবার একমাত্র পথ। আমি তোমাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে দেবো। বিপদের কোন সম্ভাবনাই থাকবে না।

–আমার হাত–পা ঠান্ডা হয়ে আসছে।

–আমারও পা কাঁপছে, দেখো।

এন্ডি ইচ্ছা করে পা কাঁপাতে লাগলো। ফায়জা ভীত স্বরে হাসলো। এন্ডি নিকটবর্তী একটি গাছে দড়ি বাঁধলো। অন্য প্রান্তটা ফায়জার কোমরে বাঁধলো। টেনে–টুনে নিশ্চিত হলো বন্ধনটা মজবুত হয়েছে কিনা! ফায়জা বিশেষ মনের জোর পাচ্ছে না। কিন্তু এন্ডি তাকে পেছনে রেখে যে যাবে না সেটাও স্পষ্টই বুঝতে পারছে। এন্ডির পিছু পিছু সাঁকোর উপরে উঠলো ফায়জা। নীচের দিকে না তাকানোর চেষ্টা করছে কিন্তু সফল হচ্ছে না। চোখ চলেই যাচ্ছে। অনেক নীচে সোনালী একটা রেখার মতো শীর্ণকায় একটি ঝর্ণা বয়ে চলেছে। মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে উঠলো ফায়জার। এন্ডি ঘন ঘন পিছু ফিরে তাকাচ্ছে। –নীচে তাকিও না। সোজা হয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকো। দুই হাতে দু'পাশের দড়ি ধরে থাকো। ভয়ের কিচ্ছু নেই। তার কথা ফায়জার কানে খুব একটা যাচ্ছে না। তার হৃৎপিন্ড এতো জোরে ধুক্‌ধুক্ করছে যে কানে শুধু সেই শব্দই যাচ্ছে। কতদূর এসেছে, কতদূর যেতে হবে, কিছুই লক্ষ্য করছে না ও। ঘাড় ঘুরিয়ে সামনে পেছনে তাকাতেও সাহস হচ্ছে না। এন্ডি হাত ধরে এক টান দিয়ে ওকে যখন আবার মাটিতে নামিয়ে আনলো তখন যেন ওর সম্বিত ফিরলো। ধপাস্ করে মাটিতে বসে পড়লো ও। এমন ভয়ানক কাজ ও জীবনে কখনো করেনি। এন্ডি ওর কোমর থেকে দড়িটা খুলে দিলো। এবার ব্যাগের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে কাপড় দিয়ে ঢাকা একটা ছোট্ট ব্যাগ বের করলো। কাপড়টা সরাতে যা দেখা গেলো ফায়জা নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারলো না। দুইটা ডিনামাইট স্টিক! এন্ডি দ্রুত হাতের স্টিক দু'টাকে সাঁকোটার গায়ের সাথে ঠেস দিয়ে রাখলো। পকেট থেকে ম্যাচ বের করে ফিউজ দু'টাতে আগুন ধরিয়ে দিয়েই পিছিয়ে এলো। ফায়জাকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে একটানে ওকে সহ প্রায় শ'খানেক ফুট দূরে সরে এলো। মাটিতে শুয়ে পড়লো।

ফায়জা কাঁপা কন্ঠে বললো–ডিনামাইট কোথায় পেলে তুমি?

–এটা কোন কঠিন ব্যাপার নয়। কিন্তু ব্রিজটা ধ্বংস করাটা জরুরী। এইপারে আসতে হলে ওদে[illegible]মরা অর্ধেকটা দিন সময় বেশী পাবো। এইবার ফুটবে। মাথা নীচু [illegible]

ভুল করেছি ভালোবেসে

প্রায় সাথে সাথেই বিস্ফোরিত হলো ডিনামাইট দু'টা। প্রচন্ড শব্দে চারিদিক কেঁপে উঠলো। পাহাড়ে পাহাড়ে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হলো সেই শব্দ। ফায়জা চোখ তুলে দেখলো ব্রিজটা ভেঙ্গে নীচে পড়ে গেছে। সে অবিশ্বাসী কন্ঠে বললো –আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না তুমি সাথে ডিনামাইট নিয়ে এসেছো!

এন্ডি উঠে দাঁড়ালো। –চলো, এগুনো যাক। কেবিনটা খুব বেশী দূরে নয়।

তাকে হাঁটতে দেখে ফায়জাও পেছন নিলো। এখন এন্ডি ছাড়া ওর আর কোন গতি নেই। পেছনের দলটা এই ক্যানিয়ন কিভাবে পার হবে কে জানে?

বিস্ফোরণের শব্দটা বহুদূর থেকেও পরিষ্কার শুনলো অনুসরণকারী দলটা। পরস্পরের মুখের দিকে তাকালো ওরা। অফিসার প্যাট্রিক বললো –ডিনামাইট মনে হচ্ছে। নিশ্চয় কোন কিছু ধ্বসিয়ে দিয়েছে।

কোডি হতাশ গলায় বললো–ছেলেটা পরিকল্পনা করেই এদিকে এসেছে। সাথে ডিনামাইট আনতেও ভোলেনি। না জানি কি সর্বনাশ করলো!

টম বললো–কেবিনে যাবার পথে একটা কাঠের ব্রিজ আছে।

জোন বললো–তাহলে আর কি! সেটাকেই ফেলে দিলো ও।

টম চিন্তিত মুখে বললো–ঐ ব্রিজটা ছাড়া ক্যানিয়ন পার হওয়া যাবে কিনা জানি না।

অমর বললো–ওখানে একটা ক্যানিয়নও আছে নাকি?

–হ্যাঁ। শ'খানেক ফুট গভীর তো হবেই।

কোডি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লো। –সেই পর্যন্ত যাই আগে। নিশ্চয় কোন একটা ব্যবস্থা করা যাবে।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে চড়াই বেয়ে উঠছে এন্ডি এবং ফায়জা। খানিকটা দূরেই একটা পাহাড়ের চূড়া নজরে পড়ছে। দূর থেকেই ঝর্নার কল কল শব্দ শোনা যাচ্ছে।

ফায়জা [illegible] রকটা জলপ্রপাত নাকি?

–ফ্লাইং রক ওয়াটারফল্‌স্। শ'খানেক ফুট উঁচুতো হবেই। কেবিনটা ঠিক ওটার পাশেই।

ফায়জা উচ্ছ্বল ভঙ্গিতে দৌড় দিলো। একটা বিশাল পাথরের চাং পার হতেই চূড়ার প্রায় শরীর ঘেষে দাঁড়িয়ে থাকা ছোট্ট কেবিনটা চোখে পড়লো। ঠিক পাশ দিয়েই ক্ষীণধারা একটা ঝর্না সোজা নীচে গিয়ে পড়ছে। কম করে হলেও শ'খানেক ফুট নীচু তো হবেই। ফায়জার উচ্চতা ভীতি আছে। সে খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে এই অসম্ভব সুন্দর দৃশ্যটা উপভোগ করতে লাগলো। এন্ডি ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

ফায়জা বললো –সাংঘাতিক সুন্দর জায়গা!

এন্ডি দু'হাত বাড়িয়ে নাটকীয় কণ্ঠে বললো –এই তো আমার স্বর্গ। আমার এই স্বর্গে আমি তোমাকে সুস্বাগতম জানাচ্ছি। স্বাগতম! স্বাগতম! স্বাগতম!

ফায়জা হাসলো। –তোমার স্বর্গে আমার একটু শোবার ব্যবস্থা করে দাও। পায়ের ব্যথাটা আবার ফিরে এসেছে।

এন্ডি মাথা নোয়ালো। –বান্দা তোমার খেদমতে হাজির, রাজকন্যা। চলো আমার সাথে রাজপ্রাসাদে।

ফায়জা খিল খিল করে হেসে উঠলো। এতো সুন্দর পরিবেশে এলে মানুষের মন এমনিতেই হালকা হয়ে যায়। তার কেন যেন বেশ ভালই লাগছে। এন্ডির প্রতি খানিকটা কৃতজ্ঞতাবোধও অনুভব করছে। ও যদি জোর করে ধরে না নিয়ে আসতো তাহলে হয়তো সারা জীবনেও এমন রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা ওর হতো না। এখন ভালোয় ভালোয় ফিরে যেতে পারলেই হয়।

এই কেবিনটাও প্রায় একই কায়দায় বানানো। ভেতরের ডিজাইনও প্রায় হুবহু প্রথম কেবিনটার মতই। লিভিংরুম লাগোয়া কিচেন, করিডোরের দু'পাশে দু'টি রুম, শেষ মাথায় ওয়াশরুম। তবে একটা পার্থক্য ঝট্‌ করেই নজরে পড়লো। এই কেবিনটা আরেকটু মজবুত করে বানানো। দেয়ালগুলো সবই কাঠের গুড়ির। ছাদটাও মজবুত করে বানানো। পাহাড়ের এতো উপরে নিশ্চয় বাতাসের বেগ যথেষ্ট বেশী। বিশেষ করে ঝড়ের সময়। মজবুত না হলে কোন ঘরবাড়ি মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না।

ফায়জাকে ওর ঘরটা দেখিয়ে দিলো এন্ডি। কেবিনেট খুলে কিছু বিছানার চাদর, কম্বল বের করলো। নিজেই বিছানা করে দিলো। ফায়জা কৌতুহলী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দেখে বললো–আমার বাবা–মা এখানে প্রায় এসে থাকতেন। তারাই বহু জিনিষপত্র এনেছিলেন সাথে

করে। যাইহোক, তুমি একটু বিশ্রাম করে নাও। আমি দেখি খাবার–দাবারের ব্যবস্থা করা যায় কিনা।

সে চলে যেতে বিছানায় সটান শুয়ে পড়লো ফায়জা। পরিচিত এলাকা থেকে দূরে, এই জঙ্গলের গভীরে এক পাহাড়ের চূড়ায় ছোট্ট কেবিনে একটা বিছানায় সে শুয়ে আছে ভাবতেই তার অবাক লাগছে। সে অকারণেই নীচু স্বরে হাসতে লাগলো।

ক্যানিয়নের সামনে এসে থমকে দাঁড়ালো অনুসরণকারী দলটা। কাঠের সাঁকোটির কিছু চিহ্ন এখনও রয়েছে। বিস্ফোরণে মাঝের অংশটুকু সম্পূর্ণ উড়ে গেলেও গোড়ার দিকে খানিকটা অটল রয়েছে।

কোডি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লো। –যা ভেবেছিলাম আমরা, তাই হয়েছে। বদমাশটা ব্রিজটা উড়িয়ে দিয়েছে।

জোন তিক্ত কণ্ঠে বললো–কি করবার চেষ্টা করছে ও! ওর পান কি?

রবার্ট বললো–আমাদেরকে দেরী করিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। আমাদেরকে এখন ক্যামিয়ন ঘুরে যেতে হবে। বেশ কিছু মাইল যোগ হবে আমাদের পদভ্রমণের হিসাবে।

অনীতা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো–পিটিয়ে তক্তা বানাবো ওকে আমি!

জেসলিনও ক্ষুব্ধ গলায় বললো–এন্ডি এতো ছোট লোক হতে পারে জানতাম না।

জোন মন্তব্য করলো–মানুষ চেনা কি এতো সহজ ভেবেছো? এখানে বসে একটু বিশ্রাম নেয়া যাক।

তার কথায় কেউ আপত্তি করলো না। কে-নাইন ক্যানিয়নের অন্য দিকে লক্ষ্য করে ক্রমাগত ডাকতে লাগলো। প্যাট্রিক তাকে ঠাণ্ডা করবার চেষ্টা করছে। রবার্ট একটু এগিয়ে চারদিকটা পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো। পাহাড় বেয়ে নীচে নামার একটা পথ তার চোখে পড়েছে। কিন্তু ওপাশের পাহাড়ে উঠবার কোন পথ দেখতে পেলো না। নীচে নামার পর খুঁজতে হবে। কোন না কোন একটা পথ নিশ্চয় পাওয়া যাবে। কিন্তু সব মিলিয়ে নিদেনপক্ষে ছয়–সাত ঘন্টার ধাক্কা। এণ্ডির প্যানটা সেও ঠিক ধরতে পারছে না। সে নিশ্চয় জানে সময় বেশী লাগলেও কেবিনে শেষ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে পুলিশ। সেক্ষেত্রে ওর পালানোর পথ কোথায়? আরো গভীর জঙ্গল? ও প্রায়ই এদিকে আসে। হয়তো আরো গভীরে কোন মাথা গোঁজার ঠাঁই করে রেখেছে। শ্রাগ করলো সে। কোন কিছুই অসম্ভব নয়।

ছোটখাটো একটা ঘুম দিয়ে উঠেছে ফায়জা। শরীরটা ঝরঝরে লাগছে। ঘড়ি দেখলো। বিকাল ছয়টা। যার অর্থ ঘন্টাখানেকের কিছু বেশী ঘুমিয়েছে ও। রান্নাঘর থেকে খুটখাট শব্দ ভেসে আসছে ... মে চলে এলো। অন্য কেবিনটার মতো এরও দেয়ালে বেশ কিছু ছবি ঝুলছে। ফা... লাতে লাগলো। এণ্ডির ছোটবেলার ছবি। ভীষণ মিষ্টি চেহারার এক বালক। মুচকি হাসলো ফায়জা। এই মুখ দেখলে যে কোন বালিকা প্রেমে পড়ে যাবে। এণ্ডির জন্য নিশ্চয় অনেকেরই রাতের ঘুম নষ্ট হয়েছে। এণ্ডির বাবা–মায়েরও কয়েকটা ছবি দেখা গেলো। দু'জনাই হাস্যময়, তরুণ। এন্ডির বয়সী ছেলে আছে তাদের ছবি দেখে বোঝা যায় না। ওর উপস্থিতি টের পেয়ে ঘাড় ঘুরে তাকালো এণ্ডি।

ফায়জা বললো–ভেবেছিলাম এখানে এসে তোমার বাবা–মায়ের সাথে দেখা হবে। সেজন্যেই তো এতোদূর আসা, তাই না?

–ব্যস্ত হয়ো না। সাপারের পর তাদের কাছে নিয়ে যাবো তোমাকে।

–কোথায় থাকেন তারা?

–বেশী দূরে নয়।

–তাদের সাথে দেখা করার পর আমরা কি ফিরে যাবো? তুমি তো ব্রিজটা ভেঙে দিয়েছো। ফিরবো কি করে?

–আমরা ঐ পথে ফিরবো না। কাছাকাছি একটা ছোট শহর আছে। ঐ পথে যাবো আমরা।

–সেটা এখান থেকে কত দূরে?

–কখনো যাইনি সেখানে। কিন্তু আমার ধারণা উত্তর বরাবর মাইল দশেক হবে। টমের বাবা আমাকে একবার বলেছিলেন।

–আরো দশ মাইল?

–দেখতে দেখতে পথ ফুরিয়ে যাবে। কাল তোমাকে খাসা একটা রেস্টুরেন্টে খাওয়াবো, কথা দিলাম।

–তোমার রান্নাইতো বেশ ভালো লাগছিলো!

–হ্যাঁ, তাতো বটেই! ঠাট্টা করছো!

ফায়জা হেসে উঠলো। –না, সত্যিই।

রাতের খাবারটা বেশ তারিয়ে তারিয়ে খেলো ফায়জা। শেষ পর্যন্ত এই যাত্রার অবসান হতে চলেছে জেনে তার অসম্ভব ভালো লাগছে। প্রাথমিক উদ্বেগ এবং ভীতিটুকু বাদ দিলে সব মিলিয়ে চমৎকার একটা অভিজ্ঞতা। এণ্ডির বাবা–মায়ের ছবি দেখে তো মনে হয় না তারা জটিল মানুষ। তাদের সাথে দেখা হলে ভালোই হবে। নিশ্চয় এণ্ডিকে কিছুক্ষণ তিরস্কার করবেন তারা এমন ভুল করেছি ভালোবেসে ন্য।

আজকের মেনুতে টিনজাত কোন খাবার নেই। অধিকাংশই আলু জাতীয় বস্তু। এণ্ডি মাটি খুঁড়ে সংগ্রহ করেছে। এতোদূরে খাবার বয়ে নিয়ে আসা কঠিন ব্যাপার। ফলে এখানে এলে সে হয় শিকার করে, নয়তো মাটি খুঁড়তে বসে যায়। খেতে খারাপ লাগলো না। দেখতে দেখতে অন্ধকার ঘনিয়ে এলো বাইরে। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখীদের ঘরে ফেরা দেখলো ফায়জা উন্মুক্ত দরজা দিয়ে। কাছেই নিয়ত বয়ে চলা ঝর্ণার ছল–ছল শব্দ ক্রমাগত ঝাপ্টা দিচ্ছে কানে। ওরা যখন কেবিন ছেড়ে বাইরে পা রাখলো তখন আলোর শেষ রেশটুকুও মুছে গেছে। ফায়জা অবাক হয়ে দেখলো আকাশে পূর্ণ চাঁদ। এই ক'দিন ধরে সে চাঁদ দেখেছে বলেও তার মনে পড়লো না। মানসিক অস্থিরতা এবং উদ্বিগ্নতা যে সৌন্দর্যবোধ কমিয়ে দেয়, তাতে কোন সন্দেহ নেই। জলপ্রপাতটিকে কাটিয়ে এগিয়ে চললো ওরা। স্বচ্ছ পানিতে চাঁদের রূপালী দ্যুতি ঝিকমিক করছে। নীচে শান্ত সমাহিত উপত্যকায় মোলায়েম একটা প্রলেপের মতো জোছ্নার আলো দাঁড়িয়ে পড়েছে। আলো–আঁধারির সেই অদ্ভুত মিশ্রণ হৃদয়ে দোলা দিয়ে যায়। ফায়জা মুগ্ধ হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলো। এণ্ডি এগিয়ে যাচ্ছে ফলে তাকেও পিছু নিতে হলো।

–যাচ্ছি কোথায় আমরা?

–দেখলেই বুঝবে।

আরো শ'খানেক ফুট এসে বিশাল পাথুরে একটা সমতল চূড়া নির্দেশ করলো ও।

–এটাই হচ্ছে ফ্লাইং রক। আর নীচের যে উপত্যকাটা দেখছো, ওটার নাম হচ্ছে ফ্লাইং রক ভ্যালে।

ফায়জা মুগ্ধ কণ্ঠে বললো–এমন অসম্ভব সুন্দর দৃশ্য আর কখনো দেখিনি আমি!

এন্ডি সাবলীল পায়ে হেঁটে ফ্লাইং রকের সমতল পাটাতনের উপর গিয়ে দাঁড়ালো। মাত্র ফুট দশেক পরেই ঝট্ করে খাড়া নীচে নেমে গেছে পাহাড়। কম করে হলেও শ'খানেক ফুট গভীরতা হবেই। ফায়জার ধারণা তার বেশীই হবে। সে সাহস করে এন্ডির পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারলো না। ঢাল থেকে ফুট বিশেক দূরত্ব বজায় রেখে একটা গাছের কান্ডের পাশে দাঁড়ালো। উপর থেকে সব কিছু দেখতে সুন্দর লাগলেও তার শুধু পড়ে যাবার ভয় হয়। এন্ডির কোন উচ্চতাভীতি আছে বলে মনে হয় না।

এন্ডি সম্মোহিতের মতো সামনের উপত্যকায় দৃষ্টি রেখে বললো–আমার কাছে সারা পৃথিবীর সবচে... হচ্ছে এই ছোট্ট জায়গাটা। যখনই এখানে আসি মনে হয় ঘরে ফিরে এসেছি, বাবা– ফিরে এসেছি।

–কোথায় তোমার বাবা–মা?

এন্ডি আরো কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে নীচের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলো। –ওখানে।

ফায়জা হতবিহ্বল কণ্ঠে বললো–কোথায়?

–নীচে, একদম নীচে। এমনই এক পূর্ণিমা রাতে, এইখানে, এই পাথরের সমতল বুকে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁরা দু'জন, হাতে হাত ধরেছিলেন, দু'জনে হয়তো দু'জনার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হেসেছিলেন, অথবা হয়তো শেষ একটি চুম্বন, তারপর এক আচমকা ঝট্‌কায় নিজেদের ভাসিয়ে দিয়েছিলেন বাতাসে পাখীর মতো, তাঁদের দু'হাত ছড়িয়ে দিয়েছিলন বাতাসে পাখীর ডানার মতো, বাতাসের স্রোতেরা খেলে বেড়াচ্ছিলো তাঁদের চোখে–মুখে, চুলের ঝাঁকে। সেই যাত্রা তাঁদেরকে পৌঁছে দিলো মা ধরিত্রীর বুকে, চির শান্তি'র জগতে। তাঁদের শরীরের অবশিষ্ট পানির টানে অনেকদূর পর্যন্ত চলে গিয়েছিলো।

ফায়জার দম বন্ধ হয়ে আসছে, সে নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারছেনা। –কি বলছো এসব তুমি?

–পরস্পরের প্রতি তাদের প্রচন্ড ভালোবাসা জাগতীয় তুচ্ছ দৈনন্দিন জীবনের পাকে আটকিয়ে থাকতে চায়নি। তারা তাদের আত্মাকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন।

ফায়জা ফিসফিস করে বললো –তোমার একটা কথাও আমি বিশ্বাস করিনা। কোথায় তারা, ঠিক করে বলো?

এন্ডি স্বগতোক্তির মতো বললো –আমি টমদের সাথে থাকতাম। আমার বাবা–মার তরুণ বয়সের সন্তান আমি। তারা একটা শিশুর দায়িত্ব নেবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। ফলে আমাকে রেখে যান টমের মা, আমার ফুপুর কাছে। আমার বয়স তখন চার। মাঝে মাঝে আমাকে দেখতে আসতেন তারা। সাথে করে আনতেন কত রকমের উপহার। সেই সময়টুকু আমার কাছে স্বর্গীয় মনে হতো। কিন্তু তারা কখনই বেশীদিন থাকতেন না। হয়তো দুই–তিন দিন। তারপরেই আবার কোথায় কোথায় চলে যেতেন। ছবি আঁকতেন দু'জন। তাদের মন ছিলো এক ভিন্ন ধাতে গড়া। সাধারণ মানুষের মতো স্বাভাবিক জীবন–যাপনে তাদের অনীহা ছিলো। কিছু মানুষ এমন থাকেই।

ভুল করেছি ভালোবেসে

কথাই বলছে। তাকে ভয় পাইয়ে দেবার জন্য এতোখানি অভিনয় করবার দরকার ছিলো না তার। সে নরম গলায় বললো –তুমি নিশ্চয় তোমার বাবা–মাকে খুব মিস করতে।

–নিশ্চয়। তাদের সঙ্গ স্মৃতি হবার পর থেকে মাত্র হাতে গোনা কয়েকদিন পেয়েছি। বাস্তবের চেয়ে তাদের ছবির সাথেই আমার আলাপ হয়েছে বেশী। এই জন্যেই এখানে আসি। এখানে, এই পাথরের উপরে এসে দাঁড়ালে আমি যেন তাদের অস্তিত্ব টের পাই। মনে হয় তাদের উপস্থিতি অদৃশ্য বাতাসের ডানায় ভর করে ভেসে বেড়াচ্ছে এই উপত্যকার অভ্যন্তরে। এখানে আমি এলে, তারা আমাকে দেখতে পান।

ফায়জা কাঁপা গলায় বললো–খুবই দুঃখজনক। আমি নিশ্চিত তারা তোমাকে ভীষণ ভালোবাসতেন।

–তাতো বাসতেনই। দু'জন মানুষ যখন পরস্পরকে এতো গভীরভাবে ভালোবাসতে পারেন, তখন পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর প্রতি তাদের প্রগাঢ় ভালোবাসা তৈরী হয়ে যায়। তাদের অস্তিত্ব তখন এই নশ্বর পৃথিবীর পার্থিব নোংরামি অতিক্রম করে উঠে যায় এক ভিন্ন স্তরে, সেখানে পূর্ণিমা রাতের মতো প্রেমময় এক জ্যোতি সমস্ত নোংরামি ধুয়ে মুছে নিয়ে যায়। এখানে এসে আমার হাত ধরো ফায়জা, তুমিও সেটা অনুভব করতে পারবে।

ফায়জা সম্মোহিতের মতো কয়েক পা এগিয়ে যায়। এন্ডি কয়েক পা পিছিয়ে এসে আলতো করে ওর একটা হাত নিজের হাতে তুলে নেয়।

–তোমার হাত কি কোমল আর উষ্ণ! তোমার হৃদয়ের উত্তাপ, স্বচ্ছতা তুমি ছড়িয়ে দিচ্ছো আমার শরীরে। আমার হৃদয়ের উত্তাপ কি তুমি অনুভব করছো? তোমার জন্যে যে স্বর্গীয় প্রেম আমার সমস্ত অস্তিত্বকে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে সেটা কি তুমি অনুভব করছো?

ফায়জা বেশ ঘাবড়ে গেছে। এই ধরনের একটি মুহূর্তের জন্য সে একেবারেই প্রস্তুত ছিলো না। সে থতমত খেয়ে বললো –হ্যাঁ অনুভব করতে পাচ্ছি মনে হয়।

এন্ডি উত্তেজনায় টান টান হয়ে উঠেছে, তার কণ্ঠে স্বতঃস্ফূর্ত আবেগের ঢল। সে বললো–যদি পারতাম পাঁজর খুলে তোমাকে আমার হৃদয়টা দেখাতাম। সেখানে তোমার চিত্র ছাড়া আর কিছুই নেই।

ফায়জা ভীত গলায় বললো – সেটা আমি জানি। কোন রকম পাগলামি করো না।

–তুমি কখনো ভালোবাসতে পারবে, ফায়জা?

–নিশ্চয় পারবো। আমার শুধু খানিকটা সময় দরকার!

–কিন্তু তুমি তো দেশে ফিরে যাচ্ছো?

–হয়ত চিরদিনের জন্য নয়!

এন্ডি দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লো। –চিরদিনের জন্য না হলেই ভালো। এখানে তোমাকে আমার পাশে পেয়ে আমার যে কি ভীষণ ভালো লাগছে আমি ভাষায় বোঝাতে পারবো না। আমি নিশ্চিত আমার বাবা–মাও আমাদেরকে দেখছেন এখন। আমি তাদের আত্মার সজীব উপস্থিতি টের পাচ্ছি। তুমি কিছু টের পাচ্ছো, ফায়জা?

–পাচ্ছি বলে মনে হয়।

এন্ডি হঠাৎ পকেটে হাত দিয়ে ছোট্ট একটা বাক্স বের করলো। ঢাকনা খুলে একটা লকেট বের করলো। ফায়জা লকেটটি চিনতে পারলো। এটাই সে কুঁড়েঘরে দেখেছিলো।

এন্ডি বললো–বছর পেরিয়ে গেলো, আমার বাবা–মা আমাকে দেখতে এলেন না। কেউ জানে না তারা কোথায়। শেষে আমি নিজেই তাদের খোঁজে বের হলাম। আমার বয়স তখন আঠারো। আগে গেলাম প্রথম কেবিনটাতে। সেখানে তাদেরকে পেলাম না। তারপর এলাম এখানে। টমের বাবার কাছ থেকে দিক নির্দেশনা নিয়ে নিয়েছিলাম। এই কেবিনে এসে এই লকেটটার সাথে একটা ছোট্ট নোট পেলাম।

এন্ডি লকেটটা খুলে ফায়জাকে ভেতরের পারিবারিক ছবিটা দেখালো। উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে সেটা বেশ স্পষ্টই দেখা গেলো।

এন্ডি বললো–আমার যখন চার বছর বয়স, সেই সময়ে ছবিটা তোলা। সেই বছরই টমদের বাসায় আমাকে রেখে চলে যান তারা।

ফায়জা একাধারে ভীতি এবং মমতা বোধ করে এন্ডির জন্য। সমগ্র জীবন ধরে ভালোবাসার মধ্যে থেকেও সে প্রিয় মানুষদের সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। একটু একটু করে সেই বঞ্চনা জমাট বদ্ধ হয়েছে তার হৃদয়ে।

এন্ডি লকেটের নীচ থেকে বের করা ছোট্ট নোটটা খুললো।

–আমার মায়ের লেখা। আমাকে লিখেছিলেন।

...না খুলে ধরলোও, কিন্তু সেটা দেখে পড়ে না। স্মৃতি থেকে আউ । –সোনামনি আমার, যেখানেই থাকো আমি সর্বক্ষণ তোমার সাথে আছি। কখনো ভুলো না তুমি দু'টি হৃদয়ের স্বর্গীয় ভালোবাসার অপূর্ব এক ফসল, একটি স্বর্গীয় ফুল। এই চূড়া থেকে নীচে তাকালে পৃথিবীটাকে কি ভীষণ নোংরা আর অর্থহীন মনে হয়। আমি জানি একদিন তুমি আমাদের খোঁজে আসবে। এই চিঠিটা নিশ্চয় খুঁজে পাবে। জানবে কতখানি ভালোবাসা নিয়ে তোমাকে সর্বক্ষণ আমার হৃদয়ে জড়িয়ে রেখেছিলাম প্রতিটি মুহূর্ত। তোমার মামণি।

এন্ডি নিঃশব্দে কাঁদতে থাকে। সে চিঠিটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখে। নীচের গভীর উপত্যকার দিকে সম্মোহিতের মতো তাকিয়ে থাকে। –কি ঘটেছিলো সেই রাতে বুঝতে খুব দীর্ঘক্ষণ লাগেনি আমার। কিন্তু কেন এমনটি ঘটলো সেটা বুঝতে আমার অনেকদিন লেগেছিলো।

কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে যেন নিজের মনের ভেতরে বুদবুদিয়ে ওঠা আবেগের বাষ্পগুলোকে গুছিয়ে নিলো এন্ডি। তার কণ্ঠ ভারী হয়ে এসেছে। –কখনো ভেবে দেখেছো, অসম্ভব ভালোবাসো এমন একটি মানুষের হাত ধরে এক বিরল সৌন্দর্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে কেমন লাগবে? পৃথিবী তার সহজ পার্থিব অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলবে, বস্তু তার স্বাভাবিক আকার এবং বর্ণ হারিয়ে মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে অনুভূতির সাথে, আকাশ এবং বাতাস এবং পাহাড় এবং বনানী সব কিছু এক খেয়ালী চিত্রকরের আচমকা এক তুলির আঁচড়ে নিজস্ব সংজ্ঞা হারিয়ে এক অচিন্তনীয় রকমের বিশাল অস্তিত্বের অংশ হয়ে যাবে। তখন সাধারণ মানবীয় অনুভূতি হারিয়ে গিয়ে সেখানে এক মেঘময় ভাসমান অনুভূতির স্রোত তৈরি হবে। সেই স্রোতের সামনে সুস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার ক্ষমতা নশ্বর মানুষের নেই। তারা সেই খেয়ালী স্রোতে শরীর ভাসিয়ে দেবে, চলে যাবে সেখানে যেখানে সব কিছু শেষ হয়, অথবা অন্য কোন এক জগতের শুরু হয়। কখনো সেই অনুভূতি হয়েছে তোমার?

ফায়জা ফিসফিসিয়ে বললো–না।

–আমার হয়েছে। বহুবার। এখন আমি জানি, প্রকৃত ভালোবাসার পরিণতি সেটাই হওয়া উচিৎ।

ফায়জার শরীর শির শির করে উঠলো। এন্ডিকে তার কাছে স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না। তার মধ্যে যেন এক দুরাত্মা ভর করেছে। তার টান–টান শরীর এবং সম্মোহিত আচরণ তাকে অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে। ফায়জা ধীরে ধীরে কয়েক পা পিছিয়ে এলো। তার মুখে সন্দেহ এবং ভয়ের চিহ্ন পরিষ্কার ফুটে উঠেছে।

সে নীচু কণ্ঠে বললো–আমার ঠান্ডা লাগছে এন্ডি। চলো কেবিনে ফেরা যাক।

–তুমি , ফায়জা?

–না। আমার ক্লান্তি লাগছে।

সে এন্ডির জন্য অপেক্ষা না করেই ফিরতি পথ ধরে। এন্ডি তার পিছু নিলো।

–দাঁড়াও ফায়জা। আমি আসছি। ভয় পেওনা।

সে দৌড়ে ফায়জার সঙ্গ ধরে।

কেবিনে ফেরার পথে আর কোন কথা হয়নি। ফায়জা কথা বলেনি ভয়ে। কি প্রসঙ্গ থেকে কি প্রসঙ্গে চলে যাবে, ঝুঁকি নেবার কোন অর্থ হয় না। এন্ডিকে আপন চিন্তায় বিভোর মনে হয়। সে মাটির দিকে চোখ রেখে চুপচাপ হাঁটে।

কেবিনে ফিরে নিজের ঘরে চলে এলো ফায়জা। দরজা বন্ধ করে কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাকে। এন্ডিও নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করেছে। শব্দ শুনেছে সে। তার মনটা এখন একটু খারাপই লাগছে। বেচারীর মনে অনেক ব্যথা জমা হয়ে আছে এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু তার কাছে সে যা চায় তা এখনো দেবার মতো অনুভূতি ফায়জার হৃদয়ে তৈরী হয়নি। এতো মানুষের মাঝে কেন তাকেই বেছে নিলো এন্ডি? অনীতা তার জন্য সমগ্র পৃথিবী নিয়ে দাঁড়িয়েছিলো, ফিরেও তাকায়নি সে। ফায়জাকে কেন তার এতো আপন মনে হলো? কারণটা কি এই যে সে আগেই জানতো ফায়জার জন্য কি যন্ত্রনা অপেক্ষা করছে? সে কি ভেবেছিলো একটি যন্ত্রনাকাতর মন আরেকটি যন্ত্রনা কাতর মনকে আশ্রয় দেবে? ফায়জার কাছে ব্যাপারটা রহস্যময় মনে হয়। শুধু রমনীর সৌন্দর্যই কি একটি স্বর্গীয় ভালোবাসার অনুভূতি সৃষ্টি করবার জন্য যথেষ্ট?

নিজকে অস্থির লাগে তার। ছোট্ট ঘরটার মধ্যে নিজেকে বন্দী মনে হয়। একটু বাইরের শীতল বাতাসে শ্বাস নেবার তাগিদ অনুভব করে। সে প্রায় নিঃশব্দে দরজা খুলে করিডোরে বেরিয়ে আসে। পা টিপে টিপে সদর দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। দরজা খুলে সম্মুখের বারান্দায় পা রাখে। বাতাসের ঠান্ডা একটা ঝটকা ওর শরীরের ক্লান্তি এবং উদ্বেগটুকু যেন ধুয়ে মুছে নিয়ে যায়। রেলিঙে ভর দিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে ও।

কেবিনের ভেতরে এন্ডির ব্যস্ত পদশব্দ শোনা যায়। বারান্দায় বেরিয়ে এসে ফায়জাকে দেখে স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ে সে। –তুমি ঠিক আছো তো?

–তখন তোমাকে আঘাত দিতে চাই নি আমি। কিন্তু হঠাৎ করে ওসব শুনবার পর নিজে [illegible]। আমার এমনিতেই অনেক ভয়।

[illegible] ৎ করে এইসব কথা বলবার জন্য আমারই তোমার কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিৎ। কিন্তু বাবা-মাকে আমি কখনো স্রেফ মৃত ভাবতে পারি না। ঐ পাথরের উপরে দাঁড়িয়ে, নীচের উপত্যকার দিকে তাকালে জীবনের গ্রহণযোগ্য সংগ্রহ যেন পাল্টে যায়। মৃত্যু তখন সহজ, সুন্দর মনে হয়, জীবনের পরিপূরক মনে হয়। আমার কাছে তারা কখনই মৃত নয়।

–তাদের ভালোবাসার গভীরতা চিন্তা করে আমার অবাক লাগছে।

–আমিও অবাক হই। সারাটা জীবন তেমনই একটা ভালোবাসার জন্য হা–পিত্যেষ করে মরছি। এমন একটা ভালোবাসা যা আমার হৃদয়, চেতনা এবং অস্তিত্বের প্রতিটি কর্মকে পরিপূর্ণ করে তুলবে। তুমি খুঁজছো না?

–নিশ্চয় খুঁজছি।

এন্ডি খুব যত্নের সাথে ফায়জার একটা হাত ধরে। –তোমার মতো এমন অসাধারণ সুন্দর এবং আকর্ষনীয়া মেয়ে আমি আর কখনো দেখিনি। তোমার ঐ কৃষ্ণ চোখ যেন অতল এক সাগরের মতো রহস্যময়। তোমার ঐ রক্তিম অধর যেন কোন এক শিল্পীর অসম্ভব সাধনার ফসল। তোমার হৃদয়ের উষ্ণতা আমাকে শান্ত করে, সম্পূর্ণ করে, প্রেরণা দেয়।

এন্ডি হঠাৎ করে ঝুঁকে পড়ে ফায়জার ঠোঁটে আলতো করে একটি চুমু খায়। ফায়জা কয়েকটা মুহূর্ত নড়তে পারে না। কিন্তু তারপরে সে ধীরে ধীরে এন্ডিকে ঠেলে সরিয়ে দেয়। –এসো আমরা হাত ধরে এখানে কিছুক্ষণ দাঁড়াই, চুপচাপ। এই পূর্ণিমা রাতের সৌন্দর্যটুকু উপভোগ করি।

এন্ডি তার কথামতো কাজ করে। ফায়জার একটি হাত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে ধরে তার শরীর ঘেঁষে দাঁড়ায়। –তোমার জন্য আমি অনন্তকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারি।

ফায়জা নিঃশব্দে রূপালী রাতের দিকে তাকিয়ে থাকে। একজন প্রেমময় পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে, এই রোমান্টিক পরিবেশে বিলীন হতে তার কি ইচ্ছা হয়? সে সঠিক জানে না। সম্ভবত সেই কারণেই তার নিজেকে বিক্ষুব্ধ মনে হয়। এই চমৎকার পুরুষটিকে তার ফিরিয়ে দিতে ইচ্ছে হয় না কিন্তু হৃদয়ের গভীরে কোন অচেনা সঙ্গীতের শব্দও তো শোনা যায় না। যে সঙ্গীত সে শুনেছিলো কতো কতো বছর ধরে অমরের জন্য, সে সঙ্গীত হঠাৎ করেই থেমে গেছে এক রূঢ় আঘাতে। সেই সঙ্গীতই কি ভালোবাসা? আবার কি সেই সঙ্গীত কখনো শুনবে সে?

চৌদ্দ

ঘড়ি দেখলো ফায়জা। রাত একটা। বিছানা ছাড়লো ও। প্যান্ট–শার্ট এবং জুতা পরলো। টর্চ এবং পানির বোতলটা পকেটে ঢোকালো। তার হারিয়ে যাওয়া টর্চটা এন্ডি পরে খুঁজে এনেছিলো। ছোট্ট দরজা খুলে করিডোরে বেরিয়ে এলো ও। এন্ডির ঘরের দরজা বন্ধ। কয়েকটা মুহূর্ত কান পেতে শুনলো সে। কোন শব্দ নেই। ধীর সর্তক পায়ে লিভিংরমে চলে এলো সে। দরজাটা খুলতে গিয়ে অনাবশ্যক শব্দ হলো কিছু। রাতের নিস্তব্ধতায় সেই শব্দ

অনেক জোর মনে হলো । ফায়জা উঠোনে বেরিয়ে গিয়ে পেছনের দরজাটা ভিড়িয়ে দিলো । তার পদশব্দ ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেলো ।

নিজের ঘরে শুয়ে পুরোটাই শুনলো এন্ডি । তার ঘুম খুবই পাতলা । ফায়জার ঘরের দরজা খোলার সামান্য খুট্ শব্দেই ঘুম ভেঙ্গে যায় তার । ভেবেছিলো হয়তো বাথরূমে যাবার জন্য উঠেছে । কিন্তু যখন পদধ্বনি লিভিংরূমে গেলো তখনই তার মনে সন্দেহ হয় । দরজা খোলার শব্দে সন্দেহ দৃঢ় হয় । ব্যাপারটা সে ঠিক বুঝতে পারে না । সে তো এমন কিছু করেনি যে জন্যে তাকে ভয় পেতে পারে ফায়জা । তবে কেন সে তার কাছ থেকে পালিয়ে যেতে চায় । কয়েকটা মুহূর্ত যায় দ্বিধাদ্বন্দ্বে । সে কি তাকে যেতে দেবে এবং আশা করবে গতবারের মতই নিজেই ফিরে আসবে ফায়জা? নাকি তাকে থামাবে? এই গভীর রাতে পাহাড়ি পথে কত রকমের বিপদ হতে পারে । বিশেষ করে অনভ্যস্ত একটি মেয়ের জন্য এই পথ ভয়ানক হতে পারে । তাকে থামানোরই সিদ্ধান্ত নিলো ও । ফায়জার পদশব্দ দ্রুত মিলিয়ে যেতে শুনলো । ঝট্পট বিছানা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলো । বাইরের দরজা খুলে বারান্দায় চলে এলো ও । ফায়জাকে কোথাও দেখা গেলো না । ফায়জার নাম ধরে ডাকবার জন্য মাত্র মুখ খুলেছিলো ও, হঠাৎ মাথায় শক্ত কিছুর আঘাত পেয়ে মাটিতে ধ্বসে পড়লো ওর শরীরটা । মুহূর্তের মধ্যে চেতনা লোপ পেল । ফায়জা মোটা কাঠের লাঠিটাকে ছুড়ে ফেলে দিলো । বারান্দায় পড়ে থাকা এন্ডির রক্তাক্ত শরীরটা দেখে তার দু'চোখ ভিজে উঠলো । এই নিষ্ঠুরতার কি কোন দরকার ছিলো? খুব কি বেশী জোরে লাগলো? বাঁচবে তো ও? তার শরীর থর্ থর্ করে কাঁপছে । কিন্তু সে জানে পালানো ছাড়া তার উপায় নেই । গতকাল এন্ডির যে রূপ সে দেখেছে তাতে সে যে স্বাভাবিক ভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে সক্ষম হবে সে নিশ্চয়তা ফায়জা পাচ্ছে না । মানুষ আবেগপ্রবণ হয়ে উদ্ভট সব কাজ করে । স্বর্গীয় ভালোবাসার খোঁজ কে না করে কিন্তু তাই বলে জীবন দিয়ে একটি ভালোবাসা প্রতিষ্ঠিত করবার ধারণাটা তার কাছে অসুস্থ মনে হয় ।

ফায়জা টর্চলাইটের আলোয় দ্রুত এন্ডির ক্ষতটা পরীক্ষা করে । খুব বেশী রক্তপাত হচ্ছে না । আচমকা আঘাতেই সংজ্ঞা হারিয়েছে সে । খানিকটা সান্তনা পেলো ফায়জা । এন্ডির কোন ক্ষতি করবার তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই । বরং কোন ক্ষতি হলে সে নিজেকে কখনো ক্ষমা করতে [illegible]ন সময় সংজ্ঞা ফিরে পেতে পারে । ফায়জা আর অপেক্ষা করলো না । উত্তর বরাবর রওনা হলো । আট-দশ মাইল পথ কি খুব বেশী? সে কি ছোট্ট শহরটা খুঁজে পাবে? স্বাভাবিকভাবে চিন্তা করতে পারছে না ও । তার একমাত্র উদ্দেশ্য এখন এন্ডির কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়া ।

ভুল করেছি ভালোবেসে

অনেক ভোরেই রওনা দিয়েছে অনুসরণকারী দলটা । গত রাতেও জঙ্গলে কাটিয়েছে তারা । প্রথম রাতের অভিজ্ঞতার পর দ্বিতীয় রাতটা প্রায় সবাই কম বেশী উপভোগ করেছে । খানিকটা ক্যাম্পিংয়ের অভিজ্ঞতা হবার মতো । ঘুমাতে কারোরই তেমন অসুবিধা হয়নি । ফলে ভোরে কোডির তাড়া খেয়ে কেউ কোন আপত্তি করেনি ।

গতরাতেই উপত্যকার গোড়ায় পৌঁছেছিলো ওরা । এবার উপরে উঠবার পালা । একটা পাহাড়ী ঝর্না আঁকা বাঁকা পথ ধরে বয়ে গেছে । ছোট ছোট পাথরে পা ফেলে ফেলে ঝর্নাটা পার হচ্ছে ওরা । কোডি বললো-আর কয়েক মাইল গেলেই আবার আগের ট্রেইলে পৌঁছে যাবো আমরা । কোথায় পালাবে এন্ডি ।

জোন রাগী কণ্ঠে বললো-শয়তানটাকে ধরে আচ্ছাসে একটি পিট্টি না দেয়া পর্যন্ত শান্তি হচ্ছে না আমার ।

কোডি আঁতকে বললো-দেখো বন্ধু আবার পুলিশি ঝামেলায় ফেলে দিও না ।

জোন হেসে ফেললো ।

অনীতা ক্ষুদ্ধ কণ্ঠে বললো–ফায়জার কোন ক্ষতি না হলেই হয়। ঐ বদমাশটা ওকে নিয়ে কি করছে কে জানে?

টম নিরীহ গলায় বললো–মাত্র দু'দিনেই সম্ভাব্য বয়ফ্রেন্ড থেকে বদমাশ! আজব দুনিয়া!

এই কথায় একটা হাস্যরোল পড়ে গেলো। অনীতা লাল হয়ে উঠলো। জেসলিন বললো –আমার মনে া কোন ক্ষতি করবার ক্ষমতা এন্ডির আছে। ফায়জা হয়তো সব মিলিয়ে খানিকটা ভয় পেতে পারে।

অমর জোর গলায় বললো–ফায়জার কোন ক্ষতিই হবে না। আমি এটা নিশ্চিতভাবে জানি।

কোডি বললো–না হলেই ভালো। এই আনন্দময় অভিযানটা রক্তারক্তি দিয়ে শেষ হোক এটা আমরা কেউই চাই না।

এন্ডির সংজ্ঞা ফিরেছে। মাথায় প্রচন্ড ব্যথা। সমস্ত শরীরটা পাথরের মতো ভারী মনে হচ্ছে। মাথার পেছনে হাত দিয়ে দেখলো রক্ত জমাট বেঁধে আছে। কাঠের মেঝেতে বেশ রক্ত পড়ে আছে। দুর্বলবোধ হবার কারণটা বোঝা গেলো। কাঁপা কাঁপা পায়ে উঠে দাঁড়ালো ও। ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। যার অর্থ বেশ কয়েকটা ঘন্টা অজ্ঞান হয়েছিলো ও। কেবিনের ভেতরে ফায়জাকে খুঁজে পাবার প্রশ্নই উঠে না, তবুও সে ভেতরে ঢুকলো। দুর্বল কণ্ঠে ডাকলো–ফায়জা! ফায়জা!

কোন উত্তর নেই। আবার বাইরে বেরিয়ে এলো ও। মাটিতে ফায়জার পদচিহ্ন পর্যবেক্ষণ করলো। উত্তরদিকে গেছে সে। কারণটা বুঝতে অসুবিধা হলো না ওর। এই জন্যেই মনে হয় ফিরে যাবার পথ জানতে চেয়েছিলো ফায়জা। কিন্তু এতোখানি পথ কোন অবস্থাতেই একাকী যেতে পারবে না সে। প্রথমত পথ–ঘাট কিছুই চেনে না, দ্বিতীয়ত কোন বিপদে পড়লে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না। এন্ডি জানে ফায়জার পিছু নেয়া ছাড়া তার অন্য কোন উপায় নেই। মেয়েটাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এতোদূর এনেছে সে, এখন তাকে সুস্থভাবে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়াও তার দায়িত্ব।

সে আবার কেবিনে ঢুকলো। দ্রুত মাথার রক্ত পরিষ্কার করে একটা শার্ট ছিড়ে পট্টি বাঁধলো। পায়ে জুতা লাগিয়ে হাইকিং ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়লো। ফায়জার ফেলে যাওয়া ক্ষীণ পদচিহ্ন অনুসরণ করে এগিয়ে চললো ও। বেশ অনেকখানি পথ দৌড়িয়েছে ফায়জা। ডালপাল পাড়িয়েছে, হোঁচট খেয়ে বার কতক পড়েছে, ঝোপঝাড়ে খোঁচা খেয়ে কাপড় ছিঁড়েছে। এন্ডি এবার সত্যিই দুঃশ্চিন্তায় পড়ে গেলো। রাতের অন্ধকারে একটা টর্চলাইটের উপর নাটা মোটেই নিরাপদ নয়। পথের উপরে চড়াই, উৎরাই, খানা– আঘাত পাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়।

কিছুদূর গিয়েই উঁচু গলায় ফায়জার নাম ধরে ডাকতে শুরু করলো ও। –ফায়জা! ফায়জা।

চারিদিকের পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে তার ডাক। যদি সত্যিই কোন বিপদে পড়ে গিয়ে থাকে তাহলে ও জানবে এন্ডি আসছে। চিন্তার কোন কারণ নেই। বিরূপ প্রতিক্রিয়াও হতে পারে। ভাবতে পারে এন্ডি তাকে নাগালের মধ্যে পেলে হয়তো ভয়ানক কিছু করতে পারে। আতংকিত হয়ে আরো অসাবধান হতে পারে মেয়েটা। কিন্তু ওতো কখনো এমন কিছু করেনি যা দেখে ফায়জা আতংকিত হতে পারে। আজ সকালেই ওদের ফিরে যাবার কথা ছিলো, এই পথেই, দুজনে একসাথে। ফায়জা এমন উদ্ভট একটা কাজ কেন করলো বুঝতে অসুবিধাই হচ্ছে এন্ডির। মাথাটায় এখনও প্রচন্ড ব্যথা। কিছুক্ষণ পর পর ঝিম্ ঝিম্ করছে। প্রায় মাইল দুয়েক

পথ চলে এলো ও। ফায়জার গতি বেশ আগে থেকেই কমে আসছিলো। সম্ভবত ক্লান্ত হয়ে পড়ায় দৌড় বন্ধ করে হাঁটতে শুরু করে ও। গাছপালা যেখানে কম সেদিক দিকে এগিয়ে গেছে। কোথাও কোথাও নরম মাটিতে ওর পদচিহ্ন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। নিজের গতির সাথে ফায়জার গড়পড়তা গতি তুলনা করলো ও। ফায়জা যদি কোথাও না থেমে থাকে তাহলে বড়জোর মাইল দুয়েক এগিয়ে আছে। তার চেয়ে কম হওয়াই উচিৎ। একটানা এতক্ষণ সে কিছুতেই হাঁটতে পারবে না। বিশ্রাম নেবার জন্য তাকে থামতেই হবে।

এন্ডি আবার ডাকলো–ফায়জা! ফায়জা!

পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি বন্ধ হতে কান পেতে শুনলো ও। কোন প্রত্যুত্তর শোনা গেলো না।

বেশ দূর থেকেই ফ্লাইং রক কেবিনটা চোখে পড়লো ওদের। পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা কেবিনটাকে লুকিয়ে রাখার কোন চেষ্টাই করা হয়নি। বোঝাই যায় কেবিনটা যারা বানিয়েছিলো তারা কখনো ভাবেওনি এখানে অনাহুত কেউ আসতে পারে।

কোডি বললো–খুব সুন্দর জায়গা তো!

অনীতা [illegible]লো। –একটা জলপ্রপাত! কি সুন্দর! রবার্ট, দেখেছো?

রবার্ট মুগ্ধ দৃষ্টিতে অনীতাকেই দেখছিলো। এই স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে যেন তার সর্বাঙ্গ এক অপূর্ব উজ্জ্বলতা পেয়েছে। চোখ ফেরাতে পারছে না সে।

জোন বললো–এন্ডি আমাদেরকে অনেক দূর থেকে দেখে থাকবে। এখনও কেবিনে আছে আমার মনে হয় না।

কে–নাইন সরবে ডাকাডাকি করছে।

কোডি চাঁপা গলায় বললো–অফিসার প্যাট্রিক ওকে থামাও।

প্যাট্রিক গায়ে হাত বোলালো সারমেয়টার, শ...শ... চুপ্।

উৎরাই বেয়ে উপরে উঠতে থাকে ওরা। সবাই কম বেশী সতর্ক। এন্ডি অভাবনীয় কিছু করে বসবে না সেই নিশ্চয়তা কে দিচ্ছে?

খুব সতর্কপায়ে কেবিনটার দিকে এগিয়ে গেলো কোডি ও জোন। দু'জনার হাতেই পিস্ত ল। কোন ঝুঁকি নিতে রাজী নয় তারা। বারান্দায় পা দিতেই জমে থাকা রক্তের চিহ্ন স্পষ্ট দেখতে পেলো তারা। কেবিনের খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে তাকিয়ে দেখলো ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ভেতরের দিকে চলে গেছে। বারান্দায় রক্তটা পর্যবেক্ষণ করলো কোডি। –পাঁচ–ছয় ঘন্টা পুরানো মনে হচ্ছে।

কাছেই পড়ে থাকা রক্তাক্ত লাঠিটা হাতে তুলে নিলো জোন। –কি মনে হয়?

–এন্ডির মাথায় বাড়ি দিয়ে ওকে সংজ্ঞাহীন করে পালায় ফায়জা। সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে ক্ষতটার পরিচর্যা করতে কেবিনের ভেতরে ঢোকে এন্ডি। একটু পরে সেও ফায়জার পিছু নেয়।

–আমারও তাই মনে হয়। ফায়জাকে আঘাত করবার জন্য এন্ডির লাঠিসোটার দরকার হবে না। সুতরাং ধরে নেয়া যাক ফায়জা এখনো অক্ষত আছে। আমি কেবিনের ভেতরটা চক্কর মেরে আসি।

জোন সাবধানী পায়ে কেবিনের ভেতরে ঢোকে। দলের বাকিরা কোডির পাশে এসে জমায়েত হয়।

অনীতা আঁতকে উঠলো রক্তাক্ত দৃশ্যটা দেখে। –ও খোদা! কার রক্ত এগুলো?

কোডি বললো–আমাদের ধারণা এন্ডিরই হবে। ফায়জা বোধহয় পালিয়েছে। কুকুরটাকে লেলিয়ে দাও অফিসার প্যাট্রিক। সেই এখন এদেরকে খুঁজে বের করতে পারবে।

অমর শুকনা মুখে বললো–ও মনে হচ্ছে বেশ আহত হয়েছে।

অনীতা রাগী কণ্ঠে বললো–বেশ হয়েছে। ওকে একেবারে শেষ করে দিলো না কেন ফায়জা।

জোন কেবিন থেকে বাইরে বেরিয়ে এলো। –ভেতরে কেউ নেই। কে–নাইন উত্তরমুখি একটা পথে এগিয়ে যাবার জন্য ভয়ানক টানাটানি করছে। অফিসার প্যাট্রিকও মাটিতে পায়ের চিহ্ন এবং অন্যান্য চিহ্ন দেখে বললো –দু'জনাই এই পথে গেছে। কুকুরটাও ওদের গন্ধ পেয়েছে।

কোডি বললো –চলো, পিছু নেয়া যাক। এন্ডির আগেই ফায়জাকে আমাদের খুঁজে পেতে হবে।

রবার্ট বললো–সে ভালোই আহত হয়েছে। খুব দ্রুত চলতে পারবে বলে মনে হয় না।

কোডি জোর পায়ে কে–নাইনের পিছু নিলো। –জোর পায়ে চলো সবাই। এবার একটা হেস্তনেস্ত করেই ছাড়বো আমরা।

এন্ডি চেষ্টা করছে খুব জোরে জোরে হাঁটতে কিন্তু তার মাথার ঝিম ঝিমানিটা প্রায়ই তাকে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে। একটু পর পরই মাথা ঝাঁকিয়ে অনাহুত ব্যথাটা কাটানোর চেষ্টা করছে ও। ক্ষতটা দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছে মনে হয়। দপ্ দপ্ করছে ক্রমাগত। ও চেষ্টা করছে ব্যথাটা ভুলে থাকতে। চারপাশে অনবরত ঘুরছে ওর দৃষ্টি। ফায়জার চলার পথে এখনও রয়েছে ও। ছোট ছোট পায়ে এগিয়েছে ফায়জা এই পর্যায়ে এসে। যার অর্থ ভীষণ ক্লান্ত ছিলো ও। কিন্তু তবুও থামতে চায়নি। এন্ডি নিজেও ক্লান্তি অনুভব করছে। একটু বিশ্রাম নিতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু না নেবারই সিদ্ধান্ত নিলো। কেন যেন মাথা থেকে ফায়জার বিপদ হবার সম্ভাবনাটা ঝেড়ে ফেলতে পারছে না ও।

পথের উপরে ঘন করে জন্মেছে ঝোপঝাড়। পাশ কাটিয়ে যাবার উপায় নেই, কারণ দু'দিকেই খাড়া নেমে গেছে পাহাড়। সামনে যেতে হলে খানিকটা পিছনে ফিরে গিয়ে অন্য পথ ধরে এগুতে হ[illegible]াকিয়েই এন্ডি বুঝলো ফায়জা এই পথে ফিরে যায়নি। শুধুমাত্র তার এগিয়ে যাবার [illegible]া যাচ্ছে। তার বুকের মধ্যে হৃৎপিন্ডটা ভীষণ জোরে ধুকধুক করতে লাগলো। ঝোপের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেছে ফায়জা। কাঁটায় খোঁচা লেগে তার প্যান্টের সুতা উঠেছে। কয়েকটা ভাঙ্গা ডালপালা। আরো কয়েক পা এগুতেই খন্দটা চোখে পড়লো ওর। ভেজা মাটির উপরে স্পষ্ট ধস্তাধস্তির চিহ্ন। চারিদিকের আলগা ডালপালা দেখেই বুঝলো এন্ডি, পড়ে যাবার সময় হাতের কাছে যা পেয়েছে তাই জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করেছিলো ফায়জা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কোনটাই মজবুত ছিলো না। তার পতন ঠেকাতে পারেনি। এগিয়ে গিয়ে একেবারে কিনারে দাঁড়ালো এন্ডি। নীচের দিকে তাকালো। নীচেও ঘন হয়ে জন্মে আছে ঝোপ ঝাড়। তবুও তার মাঝখানে ফায়জার অচেতন শরীরটাকে খুঁজে পেতে বিশেষ অসুবিধা হলো না ওর। প্রায় ফুট ত্রিশেক নীচে পড়ে যায় ফায়জা। ওর কপাল ভালো যে ঝোপঝাড়গুলো ছিলো। সেখানে আটকিয়ে যাওয়ায় আরো ফুট পঞ্চাশেক নীচের পাথুরে ভূমিতে পড়েনি সে। দেখে ঝট্ করে আঘাতের কোন চিহ্ন চোখে পড়লো না। হয়তো ভয়েই জ্ঞান হারিয়েছে ফায়জা। অথবা কোন ছোট–খাটো পাথরে মাথা ঠুকে গিয়ে থাকতে পারে। চারিদিকে সে ধরনের পাথরের ছড়াছড়ি।

এন্ডি জোর গলায় ডাকলো–ফায়জা! ঠিক আছো তুমি?

কোন উত্তর এলো না। এন্ডি ব্যাগ থেকে দড়ি বের করলো। এক প্রান্ত একটা গাছে বাঁধলো, অন্য প্রান্ত নিজের কোমরে। ধীরে ধীরে পাহাড়ের গায়ে ঠেস দিয়ে নীচে নামলো ও। ফায়জার কাছে পৌঁছে ওর নাড়ি অনুভব করলো। বেঁচে আছে ফায়জা! কয়েকবার ধাক্কা দিলো সে। –ফায়জা! ওঠো!

ফায়জার জ্ঞান ফিরলো না। এন্ডি তাকে নিজের কাঁধে চড়িয়ে খুব সাবধানে পা পা করে উপরে উঠে এলো। প্রচন্ড পরিশ্রমে তার পা জোড়া থর্ থর্ করে কাঁপছে। মাথার ব্যথাটা অসহনীয় মনে হচ্ছে। কিন্তু ওসব নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হবার সময় এটা নয়। সে ফায়জাকে নিরাপদ দূরত্বে এনে ভালো করে পর্যবেক্ষণ করলো। মাথায় ছোট্ট একটা ক্ষত দেখে বুঝলো যা ভেবেছিলো তাই–ই হয়েছে। কিন্তু বাইরে থেকে দেখে ঝট্ করে ক্ষতের পরিমাণটা বোঝা যায় না। কম করে হলেও ঘন্টাখানেকের উপরে অজ্ঞান হয়ে আছে ফায়জা। ইন্টার্নাল ব্রেন হেমোরেজ না হয়ে থাকলেই হয়। যেভাবেই হোক ফায়জাকে যত দ্রুত সম্ভব ইমার্জেন্সিতে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। এন্ডি আবার কাঁধে তুলে নেয় ফায়জার অচেতন শরীরটাকে। হাইকিং ব্যাগটা ফেলে দিলো। ওটাকে এখন আর কোন প্রয়োজন নেই। সে অসম্ভব মনের জোরের উপর নির্ভর করে উত্তরদিকে হাঁটতে থাকে।

[illegible]লা সেটা খুঁজে বের করতে অনুসরণকারী দলটারও কোন অসুবি[illegible] তাদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলো। প্যাট্রিক ঝোপঝাড় এবং মাটিতে পায়ের চিহ্ন পরীক্ষা করে বললো –মনে হচ্ছে গর্তে পড়ে যায় মিস্ ফায়জা। এন্ডি তাকে উপরে তুলে নিয়ে আসে।

কোডি হতাশ কণ্ঠে বললো–এই ভয়ই পাচ্ছিলাম। আবার এন্ডির হাতে গিয়ে পড়েছে মেয়েটা। আঘাতটা খুব বিপদজনক না হলেই ভালো।

প্যাট্রিক খন্দটা পরীক্ষা করে বললো–কোন রক্ত দেখছি না। যার অর্থ কোন কাটা–ছেড়া হয়নি। সৌভাগ্যবশত মাঝপথে একটা ঝোপের মধ্যে আটকে যায় তার শরীরটা। একেবারে নীচে পড়লে ভয় পাবার কারণ ছিলো।

রবার্ট কয়েকটা পদচিহ্ন দেখিয়ে বললো–অন্যগুলোর চেয়ে বেশ গভীর। এন্ডির জুতার ছাপ। যার অর্থ ফায়জাকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে সে।

কোডি বললো–যার অর্থ অজ্ঞান হয়ে আছে ফায়জা। ব্যাপারটা আমার কাছে ভালো লাগছে না।

জোন বললো–ফায়জাকে বহন করে বেশী জোরে এগুতে পারবে না এন্ডি। একটু দ্রু ত চললে শীঘ্রিই ওকে ধরে ফেলতে পারবো আমরা।

প্যাট্রিক বললো–সে খুব বেশীদূর যেতে পেরেছে বলে আমারও মনে হয় না। বড় জোর মাইলখানেক এগিয়ে আছে।

রবার্ট সায় দিলো। –বিশেষ করে সে নিজেও আহত। কিন্তু যেটা বুঝছি না, ঐদিকে কোথায় যাচ্ছে সে।

প্যাট্রিক শ্রাগ করলো। –বলতে পারবো না। এই এলাকাটা আমার অপরিচিত।

রবার্ট রেডিও হাতে তুলে নিলো। –স্টেশনে কথা বলে দেখি। ওরা কিছু বলতে পারে কিনা। ফায়জাকে নিয়ে এন্ডি যদি আরো গভীর বনে ঢুকে যায় তাহলে আমাদের আরো লোকজন লাগবে। ফায়জার বন্ধুদেরকেও ফিরে যেতে হবে এখান থেকে।

কোডি বললো–আরো গভীর বনের দিকে না গেলেই হয়। হে ঈশ্বর, ঐ অন্ধকে আলো দাও। আমাদের জীবনটাকে সে বারোভাজা করে খাচ্ছে!

রবার্ট রেডিওতে রিসেপশন পাওয়ার জন্য অদূরে ফাঁকা জায়গার দিকে এগিয়ে গেলো। কয়েক মিনিট পরেই ফিরে এলো সে। বেশ উত্তেজিত। –ভালো খবর আছে। উত্তরদিকে কয়েকমাইল [illegible]ছোট শহর আছে। একটা রাস্তাও চলে গেছে উত্তর–দক্ষিণ

বরাবর। এন্ডি নির্ঘাত ওদিকেই রওনা দিয়েছে। রাস্তা যেহেতু আছে গাড়ীও নিশ্চয় চলে। ওর প্যানটা এবার স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এটাই ওর পালানোর রুট ছিলো। স্টেশন থেকে কয়েক জনকে ঐ এলাকায় পাঠিয়ে দিচ্ছে। ঐ শহরে কোন শেরিফ নেই। আমাদের সময় নষ্ট না করে ওর পিছু নেয়া উচিৎ। কেউ কোন আপত্তি করলো না। বরং সবাই বেশ খানিকটা উত্তেজনা অনুভব করছে। ফায়জাকে উদ্ধার করবার সম্ভাবনা বেশ কয়েকগুণ বেড়ে গেছে। স্বাভাবিকের চেয়ে দ্রুত এগিয়ে চললো দলটা।

রাস্তাটা অপ্রশস্ত কিন্তু পিচের। কোন রকমে দু'টা গাড়ী পাশাপাশি চলতে পারে এবং গাড়ী খুব কমই চলে। ফলে এইদিকে যারা বসবাস করে তারা কোন অভিযোগ করে না। ব্রায়াম এই পাহাড়ি এলাকায় বাড়ী কিনেছিলেন পানির দামে পেয়েছিলেন তাই। তার বউ শেলিরও বন-জঙ্গল ভালো লাগে। সুতরাং বাড়ী বানিয়ে জীবনের অর্ধেকটা সময় সেখানেই কাটিয়ে দিয়েছেন। জিনিষপত্র কিনতে হলে বেশ খানিকটা ড্রাইভ করতে হয়, কিন্তু সেটা বিশেষ সমস্যা নয়। সপ্তাহে একবার গেলেই চলে। আগে কাজে যাবার জন্য প্রতিদিন পঞ্চাশ মাইল ঠেঙাতে হতো। রিটায়ার করার পর সেই সমস্যাও গেছে। ছেলেমেয়েরাও কাজ কর্ম নিয়ে এদিক সেদিক চলে গেছে। এখন দুই বুড়া-বুড়ির সংসার। আজ তাদের গ্রোসারী করবার দিন ছিলো। কেনা-কাটা করে কয়েকজন বন্ধুর সাথে গাল-গপ্প সেরে ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে গেলো। শেলি দিন থাকতে থাকতেই বের হতে চেয়েছিলেন। বুড়া আবার রাতে ভালো দেখেন না। তিনি নিজে ড্রাইভ করেন না। গাড়ীতে উঠে বার বার সতর্ক করে দিয়েছেন স্বামীকে। কোন অবস্থাতেই গতি ত্রিশের উপরে যেন না ওঠে। ব্রায়ান বুড়িকে ভয় পান। ধীরেই চালাচ্ছেন তিনি। নির্জন রাস্তা। একটু পর পরই বাঁক। সামনের বাঁকটা ঘুরতেই রাস্তার উপরে একটি লোককে একটি মেয়েসহ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পিলে চমকে যাবার অবস্থা হলো তার। এমন একটা অভূতপূর্ব দৃশ্য এই রাস্তায় ইতিপূর্বে কখনো দেখেননি তাদের দু'জনার কেউই। নিজের অজান্তেই ব্রেক কষে গাড়ী থামিয়ে ফেললেন ব্রায়ান। রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। যেতে হলে তার গায়ের উপর দিয়ে গাড়ী চালিয়ে যেতে হবে।

শেলি ধমকে উঠলেন-থামলে কেন? চোর ডাকাত হতে পারে ওরা। আমাদেরকে মেরে সব নিয়ে যাবে।

মেয়েটা তো মনে হচ্ছে বিপদে পড়েছে। সাহায্য দরকার।

ভুল করেছি ভালোবেসে

ফেলবে।

-এতো দুঃশ্চিন্তা করো না। মেয়েটাকে দেখে অজ্ঞান মনে হচ্ছে। নিশ্চয় স্বামী-স্ত্রী হাইকিং করতে এসে দুর্ঘটনায় পড়েছে।

লোকটা মেয়েটাকে কোলে নিয়ে গাড়ীর পাশে চলে এলো। ব্রায়ান জিজ্ঞেস করলেন -কি হয়েছে? কোন বিপদে পড়েছো?

এন্ডি বললো-ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

শেলি সন্দিহান কণ্ঠে বললেন -কি হয়েছে ওর? মারা গেছে নাকি?

এন্ডি বললো -হাইকিং করতে গিয়ে গর্তে পড়ে যায়। জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। ঘন্টা দু'য়েকের বেশী হয়ে গেছে। এখনো সংজ্ঞা ফেরেনি; কিন্তু শ্বাস-প্রশ্বাস আছে।

শেলির সন্দেহ উবে গেলো। -বলো কি! তাড়াতাড়ি পেছনের সিটে শুইয়ে দাও। হাসপাতাল এখান থেকে বড়জোর পনেরো-বিশ মাইল। বেশীক্ষণ লাগবে না। বুড়া, একটু জোরে চালিও এবার। জীবন-মরণের প্রশ্ন।

এন্ডি ফায়জাকে ব্যাকসিটে শুইয়ে দিয়ে নিজেও একপাশে বসলো। দরজা বন্ধ করতেই গাড়ী ঘুরিয়ে ফেললেন ব্রায়ান। নিকটবর্তী হাসপাতালটি ওদিকেই। তারা যেখানে থাকেন সেখানে কোন ডাক্তারও নেই।

পনের

হাসপাতালের ইমার্জেন্সীতে নিতেই একটা হুলস্থুল পড়ে গেলো সেখানে। প্রায় সাথে সাথে অপারেটিং রুমে নিয়ে যাওয়া হলো ফায়জাকে। ডাক্তারের পিছু পিছু করিডোর ধরে ছুটলো এন্ডি। ডাক্তার ব্রাউন ওর দিকে তাকিয়ে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করলেন–ওর মাথায় ইন্টারনাল হেমোরেজ হয়েছে মনে হচ্ছে। দ্রুত অপারেশন করে বিডিং বন্ধ করতে পারলে ঠিক হয়ে যাবে মানে হয়।

এন্ডি কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বললো–ও বাঁচবে তো, ডাক্তার?

–দেখা যাক। আপনার স্ত্রী খুবই শক্ত। এতক্ষণ যখন টিকে আছে তখন কোন কিছুই বলা যায় না। আমি আমার সাধ্য মতো চেষ্টা করবো।

ডাক্তার ব্রাউন অপারেটিং রুমের ভেতরে উধাও হয়ে গেলেন। এন্ডি ক্লান্ত ভঙ্গিতে নিকটবর্তী একটা বেঞ্চের উপর ধ্বসে পড়লো। অপেক্ষা করা ছাড়া তার আর কিছুই করার নেই।

হঠাৎই উপস্থিত সবাইকে চমকে দিয়ে হাসপাতালের সদর দরজা সশব্দে ঠেলে ভেতরে ঢুকলো দু'জন পুলিশ অফিসার। তাদের হাতে প্রস্তুত পিস্তল। খুবই সতর্ক পায়ে এন্ডির দিকে এগিয়ে এলো তারা। একজন গম্ভীর কণ্ঠে বললো –তুমিই এন্ডি মিলস্?

এন্ডি ঘাড় নাড়লো। –হ্যাঁ।

দ্বিতীয় অফিসারটা কড়া কণ্ঠে বললো–উঠে দাঁড়াও। মাথায় হাত রাখো। কোন রকম চালাকি করবার চেষ্টা করবে না। এবার ধীরে ধীরে উল্টা দিকে ঘোরো। দেয়ালে মুখ দিয়ে দাঁড়াও।

এন্ডি তার কথামতো কাজ করলো। প্রথমজন দ্রুত এগিয়ে এসে তার হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিলো। দ্রুতহাতে তাকে সার্চ করলো। কোমরে গোঁজা পিস্তলটা সাবধানে বের করে নিয়ে এলো।

–লোডেড।

–ওকে নিয়ে কি করবো আমরা?

–জিজ্ঞেস করে দেখি।

রেডিও বের করলো সে। –রবার্ট, বদমাশটাকে ধরেছি আমরা। মেয়েটা অপারেটিং রুমে। অবস্থা কেমন জানি না। ওভার।

রবার্টের কণ্ঠ শোনা গেলো। –ছেলেটাকে যেতে দিও না। আমরা একটু পরেই ওখানে পৌঁছে যাবো। ওভার।

–ওকে আমরা এরেস্ট করেছি। হাতে হ্যান্ডকাফ নিয়ে যাবে কোথায় বাচাধন। ওভার।

–ভালো। নজর রেখো। ধুরন্ধর। একটু বাদেই দেখা হবে। ওভার। এন্ডিকে বসার ইঙ্গিত করলো একজন অফিসার। সে এবং তার পার্টনার সতর্কভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকলো।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই হাসপাতালে পৌঁছে গেলো দলটা। তাদের অবস্থা রীতিমতো করুণ। উদভ্রান্ত মুখ, ধূলিধূসর চুল–জামাকাপড়, হাতে পায়ে ক্ষতের চিহ্ন। এন্ডিকে দেখেই তাদের মধ্যে বিশেষ রকমের একটা ক্রোধের চিহ্ন দেখা গেলো।

অমর খেঁকিয়ে উঠলো–গর্দভ! কি করেছো ওকে তুমি?

রবার্ট তাকে চেপে ধরলো। –ঠান্ডা হও।

অনীতা খোঁড়াতে খোঁড়াতে এন্ডির দিকে মারমুখি ভঙ্গিতে তেড়ে গেলো। –পিটিয়ে তক্তা করে দেবো ওকে।

কোডি এবং জোন দু'জনে মিলেও তাকে সামলাতে কষ্ট হলো। জেসলিন ক্লান্ত ভঙ্গিতে মেঝেতেই বসে পড়লো।

জোন উপস্থিত অফিসারদেরকে লক্ষ্য করে বললো–মেয়েটার অবস্থা কি?

–একজন নার্স একটু আগে এসে জানিয়েছে সে ভালোই আছে।

টম এন্ডির মাথার ক্ষতটা লক্ষ্য করে বললো –ওর মাথা থেকে এখনও রক্ত পড়ছে। মনে হয় স্টিচ লাগবে।

এতক্ষণে এন্ডি শান্ত কণ্ঠে বললো–আমি ঠিক আছি। ওটা ঠিক হয়ে যাবে।

অনীতা ঝামটা দিয়ে উঠলো–আমাকে একটা লাঠি দাও কেউ। পিটিয়ে ওকে তক্তা করি আমি। নরক যন্ত্রনা ভোগ করিয়েছে আমাদেরকে। ফায়জার যদি কিছু হয় তাহলে ওকে পিটিয়ে মারবো।

এন্ডি তাকে থামিয়ে দিয়ে বললো–ও নিজের ইচ্ছায় আমার সাথে এসেছিলো।

অমর চিৎকার করে উঠলো–মিথ্যে কথা বলছো তুমি।

অনীতাও কণ্ঠ মেলালো–ডাহা মিথ্যে কথা। ওকে না নিয়ে আমাকে নিতে পারলে না? অমন ভালো একটা মেয়েকে নিয়ে এমন ছিনিমিনি খেলবার সাহস কোথায় পেলে তুমি?

টম আবার বললো–ওর ক্ষতটা কিন্তু আমার কাছে খারাপই মনে হচ্ছে।

কোডি দেয়াই মনে হয় উচিৎ। কেউ একজন নার্সকে ডেকে আনবে দয়া করে। ওকে বহাল তবিয়তে দরকার আমাদের। নইলে ওর বিচার হবে কি করে।

এন্ডি দৃঢ় কণ্ঠে বললো–আমি সত্যি কথাই বলছি। ফায়জা আমার সাথে স্বেচ্ছায় এসেছিলো।

জোন শ্রাগ করলো। –ফায়জার মুখ থেকেই সত্যটা জানা যাবে। সেজন্যে কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে কে জানে। ক্ষুধায় আমার নাড়ি জ্বলছে। কিছু খাবার–দাবারের ব্যবস্থা করা যায়?

এন্ডি বললো–আমারও কিছু খাওয়া দরকার। ভীষণ দূর্বল লাগছে।

কোডি বললো–স্বাভাবিক। পূর্ণ বয়স্কা একটা মেয়েকে এতোখানি পথ বয়ে নিয়ে আসাটা সহজ কথা নয়।

অনীতা বিড়বিড়িয়ে উঠলো–বিষ ধরিয়ে দাও ওর হাতে। ছাগল!

ডাক্তার ব্রাউন অপারেটিং রুম থেকে বেরিয়ে এলেন। বাইরে এতো মানুষজন দেখে খানিকটা অবাকই হলেন তিনি। তবে তিনি এন্ডিকে উদ্দেশ্য করে বললেন। –ও ভালোই আছে। জ্ঞানও ফিরেছে। কিন্তু অনেক বিশ্রাম দরকার।

কোডি এগিয়ে এলো। –আমি ডিটেকটিভ কোডি। এ আমার পার্টনার ডিটেকটিভ জোন। মেয়েটির সাথে কখন আলাপ করা যাবে মনে হয়?

–আগামীকাল সকালের আগে নয়। এখন ঘুমাচ্ছে সে। আর হ্যাঁ, সে এন্ডির কথা জিজ্ঞেস করছিলো বার বার।

এন্ডি উঠে দাঁড়ালো। –আমিই এন্ডি।

এন্ডির হাতের হাতকড়াটার দিকে বোকার মতো তাকিয়ে থাকলেন ডাক্তার ব্রাউন।

অনীতা তিক্ত কণ্ঠে বললো–বাতাসে প্রেমের গন্ধ পাচ্ছি আমি। জেসলিন, তুমি পাচ্ছো?

জেসলিন মুখ বাঁকালো। –প্রেম না ছাই!

কোডি ডাক্তার ব্রাউনকে লক্ষ্য করে বললো–ধন্যবাদ ডাক্তার। কাল সকালেই ওর সাথে আলাপ করবো আমরা। আমরা সন্দেহ করছি এই ভদ্রলোকটি মেয়েটির ইচ্ছার বিরূদ্ধে তাকে নিয়ে ভুল করেছি ভালোবেসে ইনি অন্য কথা বলছেন! মেয়েটার মুখ থেকে কি হয়েছিলো জানাটা খুবই দরকার। সে কি কিছু বলেছিলো?

–নাহ্। দেখেতো মনে হলো এন্ডির জন্য দুঃশ্চিন্তাই করছিলো সে। আপনারা কাল সকালে আসুন। কিছুক্ষণ আলাপ করার সুযোগ দেবো।

তিনি বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

কোডি বললো–অফিসার রবার্ট। স্টেশনে ফিরে যাই চলো। ওখানে একটা সেলে এন্ডিকে রাতটুকুর জন্য রাখতে হবে। একজন নার্সকে চেয়েছিলাম, কেউ তো এলো না দেখি।

প্রায় সাথে সাথেই দরজা ঠেলে একজন নার্স করিডোরে এলো। –কার স্টিচ দরকার?

কোডি এন্ডির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করলো।

নার্স বললো–তুমি আমার সাথে এসো।

এন্ডি তাকে অনুসরণ করলো। তার পিছু পিছু পুরো দলটাই রওনা দিচ্ছিলো। নার্স অবাক হয়ে গেলো। –তোমরা সবাই কেন আসছো?

কোডি বললো। –ছেলেটা কিডন্যাপার। বিপদজনক। ও পালিয়ে যেতে পারে সুযোগ পেলে।

এন্ডি বললো–পালানোর কোন কারণ নেই আমার। আমরা একসাথে গিয়েছিলাম। আমি কাউকে কিডন্যাপ করিনি।

জোন তিক্ত কণ্ঠে বললো–কাল সকালেই জানা যাবে সেটা। সে এবং কোডি নার্সের পিছু নিলো। বাকীরা পেছনে রয়ে গেলো।

ষোল

ডিস্ট্রিক্ট এটর্নি (ডি.এ.) ব্রানডন সয়ারের অফিসে এন্ডি এবং তার সরকারী ডিফেন্স উকিল ডন কোহেল বসে আছে। ডন এন্ডিকে পই পই করে বলে দিয়েছে তার কাছে জিজ্ঞেস না করে মুখ না খুলতে। এমনকি ব্রানডন যদি জিজ্ঞেস করে কেমন আছো? তারও উত্তর যেন ডনকে জিজ্ঞেস না করে দেয়া না হয়। ডি.এ-রা মুখিয়ে থাকে নিরীহ মানুষজনকে ধরে ধরে

জেলে ঢোকানোর জন্য। যেখানে সত্যিকারের অপরাধীগুলো নাকে তেল দিয়ে পায়ের উপর পা তুলে মহা আরামে দিন গুজরান করে। কিন্তু তার সাথে পারে এমন ডি.এ এখনও জন্মায়নি।

ব্রানডন বেশ চোখালো চেহারার মানুষ, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। গম্ভীর চোখে এন্ডি এবং ডনকে পর্যবেক্ষণ করছেন তিনি।

ডন বললো–ব্রানডন, কেন অযথা এই ঝামেলা করতে চাও? দু'টি কম বয়সী ছেলে মেয়ে পাহাড়–পর্বতে ঘুরতে গিয়েছিলো, ভালোয় ভালোয় ফিরে এসেছে। আমার ক্লায়েন্টের কোন রকম ক্রিমিনাল রেকর্ড নেই। সে পড়াশুনায় ভালো। বর্তমানে ডক্টরাল প্রোগ্রাম করছে। সব মিলিয়ে একটা ভালো ছেলে।

ব্রানডন শান্ত কণ্ঠে বললো–দুর্ভাগ্যবশতঃ তোমার এই ভদ্র ছেলেটার কাহিনী মেয়েটার কাহিনীর সাথে মিলছে না। স্বীকার করছি এন্ডির মনে হয়তো ফায়জার ক্ষতি করবার কোন প্যান ছিলো না, কিন্তু তারপরও সে যা করেছে সেটা কিডন্যাপিংই। তোমাকে আমি যে অফার দিয়েছি সেটা মন্দ নয়। ভালো করে ভেবে দেখো। জুরির সামনে গেলে ব্যাপার আরো খারাপ হতে পারে।

ডন আপত্তি করলো। –এক বছর জেল, এক বছর প্রবেশন–অতিরিক্ত শাস্তি মনে হচ্ছে আমার কাছে। জেলটা তুলে নিয়ে দুই বছরের প্রবেশন দাও।

ব্রানডন মাথা নাড়লো। –এটা একটা ভয়ানক অপরাধ। আমি তোমার ক্লায়েন্টকে অল্পের উপর দিয়ে ছেড়ে দিচ্ছি কারণ ফায়জা তার সম্বন্ধে আমাকে অনেক ভালো কথা বলেছে। সে জেলে পচে মরু ক সেটা আমিও চাই না কিন্তু জেলে তাকে যেতেই হবে। তবে আমি ব্যবস্থা করবো সবচেয়ে কম সিকিউরিটির কোন জেলে পাঠাতে। বছরখানেক আরামসে কেটে যাবে। দরকার হলে ভেতরে বসেই পড়াশুনা করতে পারবে।

–ব্রানডন, তুমি অকারণে এই মেধাবী ছেলেটির সাথে কঠিন আচরণ করছো।

এন্ডি ডনের সমস্ত উপদেশ ভুলে সহজ কণ্ঠে বললো –অপরাধ যখন করেছি, শাস্তি আমার পাওনা। ফায়জাকে শুধু বলো ওর এই বিচার আমি মাথা পেতে নিয়েছি।

তার দু'চোখ জলে ভরে উঠেছে। সে অশ্রু ঢাকবার জন্য মাথা নীচু করে ফেললো। ফায়জা ... । সব জেনে শুনেও সত্যিটুকু ফাঁস করেছে। আর কেউ না জানলে ... সে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করু ক। এন্ডির তাতে কোন সমস্যা নেই। মেয়েটির সান্নিধ্যে যেটুকু সময় কাটিয়েছে সেটুকুর স্মৃতিচারণ করতে করতেই জেলের সময়টুকু কেটে যাবে। কে জানে, হয়তো তারপরও সেই স্মৃতিটুকুই তার চিরসঙ্গী হয়ে থাকবে।

দিন চলে যায়। একটা একটা করে দিন গিয়ে বছর ঘুরে এলো। এন্ডির মুক্তির সনদ এলো। যেদিন ও ছাড়া পেলো অমর তাকে আনতে জেলের গেটে গেলো। এন্ডি নিঃশব্দে অপেক্ষমান গাড়িতে উঠে বসে। নিঃশব্দে গাড়ি চালিয়ে দেয় অমর। কিছুক্ষণ দু'জনার কেউই কোন কথা বলে না।

শেষে এন্ডিই নীরবতা ভাঙ্গে। –আমাকে নিতে আসার জন্য অনেক ধন্যবাদ। ভাবিনি জীবনে আমার মুখ দেখবে আবার।

–তোমার ঘাড়ে কি ভুত চেপেছিলো এক আলাই জানে।

–টমের মুখে শুনলাম তুমি আর ট্রেসি বিয়ে করেছো। ভালোই হয়েছে।

–তোমার জিনিষপত্র সবই বিক্রি করে দিতে হলো। টম নিতে চাইলো না। তেমন মূল্যবান কিছুও ছিলো না যে স্টোররু মে রাখবো ভাড়া গুনে। অবশ্য তোমার বইপত্র আর কাপড় চোপড় রেখে দিয়েছি।

–টম টেক্সাসে ফিরে যাবার আগে দেখা করতে এসেছিলো। ওর মুখেই সব শুনেছি। তুমি ঠিকই করেছো।

–যদি চাও আমাদের সাথে কয়েকটা দিন কাটাতে পারো। অবশ্য ইচ্ছা হলে তুমি কেবিনেও ফিরে যেতে পারো।

এন্ডি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললো–তুমি এবং ট্রেসি মাত্র ঘর সাজিয়ে বসেছো, তোমাদের ঘাড়ে বোঝা হবার কোন ইচ্ছা নেই আমার। আমি কেবিনে যাবো বলেই ঠিক করে রেখেছিলাম। বাবা–মায়ের সাথে একবার দেখা করাটাও দরকার। এই গ্রীষ্মে তো যেতে পারিনি। সেখানে গিয়ে ক'টা দিন ঠান্ডা মাথায় ভবিষ্যত নিয়ে ভাবতে হবে। কোন স্কুল আমাকে নেবে বলেতো মনে হয় না।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লো এণ্ডি। –ফায়জা দেশে ফিরে যাবার পর ওর কোন খবর পেয়েছিলে? কেম

–একবার ফোনে কথা হয়েছিলো। আমার বাবা–মা ট্রেসিকে মোটেই মেনে নিতে পারছিলেন না। ফায়জা তাদের সাথে দেখা করে ট্রেসির সম্বন্ধে অনেক ভালো ভালো কথা শোনাবার পর তাদের মন বদলে যায়।

–ও কি অন্য কাউকে খুঁজে পেয়েছে? বিয়ে করেছে? কি করে এখন? কত স্বপ্ন দেখেছি ওর কাছে থেকে একটা চিঠি এসেছে। কি যে ভালো লাগতো ওর একটা চিঠি পেলে। আছে কোথায় এখন?

–আমাকে জিজ্ঞেস করো না। পারলে নিজেই খুঁজে নাও।

–তুমি চাওনা আমি ওর সাথে দেখা করি?

–আমার চাওয়া না চাওয়ায় কিছুই আসে যায় না। তোমার জীবন তোমার হাতে। ভালো মন্দ বুঝবার বয়স তোমার হয়েছে।

এন্ডি কথা বাড়ালো না।

পরিশেষে

বহুদূর থেকেই ফ্লাইং রক কেবিনের চারিদিকে ফুটে থাকা উজ্জ্বল রঙের গোলাপগুলো চোখে পড়লো এন্ডির। সাদা, হলুদ, লাল–কত রকমের রঙের বাহার তাদের। বুকের মধ্যে হাতুড়ি পিটাতে শুরু করলো ওর। শেষের মাইলখানেক একরকম হাওয়ায় ভেসে পেরিয়ে এলো ও। কেবিনের সদর দরজা সশব্দে খুলে ভেতরে পা রাখলো। কেউ নেই ভেতরে। সে দৌঁড়ে গিয়ে দুটি ঘরই খুঁজে এলো। কেউ নেই। কেবিনটা ফাঁকা। চিন্তিত মুখে একটু দাঁড়িয়ে থাকলো ও। বাতাস শুঁকলো। ফায়জার শরীরের গন্ধ যেন তার মস্তিষ্কের গভীরে রোপিত হয়ে গেছে। চিনতে ভুল হবার কোন কারণ থাকতেই পারে না। সে ছিটকে কেবিন থেকে বেরিয়ে এলো, উন্মাদের মতো ছুটে গেলো সম্মুখের দিকে, ঝর্না পেরিয়ে, বিশাল কালো পাথরটাকে পাশ কাটিয়ে। ফ্লাইং রকের সমতল পাটাতনের উপরে দাঁড়িয়ে আছে ফায়জা। তাকিয়ে আছে নীচে গভীর উপত্যকার দিকে। বাতাসে তার চুল কি অসম্ভব ছন্দময়তার সাথে দুলছে।

এন্ডি যেন নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারে না।

সে শান্ত কণ্ঠে বললো –জানতাম, তোমার সাথে আবার দেখা হবে। কবে ফিরে এসেছো?

–অমরের বিয়ের পর। কোন কিছুরই অর্থ খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

–সেই জন্যেই এই নির্জন পর্বতের এক পরিত্যক্ত কেবিনে এসেছো? অর্থ খুঁজতে? একাকী?

–একা ছিলাম না। রবার্ট এবং অনীতা আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে। ওরা কাছেই কোথাও ক্যাম্প করেছে। অনীতা এখন ক্যাম্পিংয়ের পাগল হয়েছে। আমার কাছে এসো এন্ডি। শক্ত করে আমার হাত ধরো।

এন্ডি সম্মোহিতের মতো এগিয়ে গিয়ে ফায়জার পাশে দাঁড়ালো। ফায়জা নিজেই তার একটি হাত নিজের হাতে মুঠি করে ধরলো। –সেদিন আমি প্রস্তুত ছিলাম না। তোমার কথাগুলো আমি হৃদয়ে অনুভব করেছিলাম কিন্তু গ্রহণ করবার মতো সাহস ছিলো না। যে সময়টুকু তুমি জেলে কাটিয়েছো সেই সময়টুকু যন্ত্রনা নিয়ে আমি কাটিয়েছি বাইরে। আমি তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলাম কী?

–তুমি ঠিকই করেছিলে। আগে সর্বক্ষণ ভাবতাম কি যেন আমার নেই। জেল থেকে বেরিয়ে এখন শুধু ভাবি, কি যেন আমার আছে। অনেক পরিণত হয়েছি আমি।

ফায়জা আবেগঘন কণ্ঠে বললো–এখনও কি উড়ে চেতে চাও? এই শীতল বাতাসে ভর করে, নীচের ... দের ঘেরা উপত্যকায়? সোনালী সুতার মতো বয়ে যাওয়া ঐ ঝর্না আমাদের অবশিষ্টটুকু বয়ে নিয়ে যাবে কত কত দূরে, ছড়িয়ে দেবে এই পর্বত, বনানী আর বৃক্ষরাজির মাঝে। তুমি যদি চাও, আমার উড়তে কোন বাধা নেই আর।

এন্ডি হতভম্ব দৃষ্টিতে ফায়জাকে কয়েকটা মুহূর্ত অবলোকন করলো। হঠাৎই এক ঝট্‌কা টানে সে ফায়জাকে নিয়ে দূরে সরে আসে।

–এসব কি বলছো তুমি? পাগল হয়ে গেছো? আমি তোমার সাথে ঘর বাঁধতে চাই। বাচ্চা–কাচ্চা নিতে চাই। নিজেদের একটা সুখের পরিবার গড়তে চাই। ভালোবাসা দিয়ে ঘিরে দিতে চাই আমাদের পরিচিত জগতটাকে।

ফায়জার চোখ বেয়ে নিঃশব্দ অশ্রুর ঢল নেমেছে। সে তা মুছবার কোন চেষ্টাই করলো না। ভারী কণ্ঠে বললো–সেই রাতে আমি তোমাকে আদর করতে দেইনি। আজ তোমার কোন মানা নেই।

এন্ডির মুখখানা ছেলেমানুষি হাসিতে ভরে উঠলো। –তোমার ঠোঁটের একটু ছোঁয়ার জন্য আমি দুনিয়া দিতে পারি! তার চুমু খাওয়া হলো না। তার আগেই তার কাঁধে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে উঠলো ফায়জা। এন্ডি তাকে ঘনিষ্টভাবে জড়িয়ে ধরে রাখলো। তার শরীরের কোমল

উষ্ণতাটুকুই যেন জানিয়ে দিলো ফায়জার ভয় পাবার কিছু নেই। সন্ধ্যার শীতল বাতাস তাদের শরীরে মোলায়েম প্রলেপ বুলিয়ে যেন যায় বলে–ভালো থেকো তোমরা, সুখে থেকো।